১৯৭৮–২০০৫

# বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস

অধ্যাপক গোলাম আযম

১৯৭৮–২০০৫

# বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস

www.icsbook.info

www.icsbook.info

১৯৭৮–২০০৫

# বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.icsbook.info

প্রকাশক
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
প্রধান কার্যালয় : আজাদ সেন্টার ৯ম তলা, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০।
০১৫২৩৮৮৪২৩, ০১৭১৫২৯২৬৬। বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ৭১১২২০৪, ০১৭৩০৩১৯১৭

© লেখকের

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৬

নির্ধারিত মূল্য : ষাট টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ
দি ডিজাইনার, বাংলাবাজার, ঢাকা

বর্ণবিন্যাস
কামিয়াব কম্পিউটার সেকশন

মুদ্রণ
কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং

ISBN-984-8285-48-1

www.icsbook.info

# ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস

১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমি সাধ্যমতো যে চেষ্টা চালিয়েছি এবং ২০০৫ সাল পর্যন্ত আরও যারা এজন্য চেষ্টা চালিয়েছেন, এ বইটিতে তারই ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে। এ ইতিহাস থেকে বোঝা যাবে, কী কারণে এখন পর্যন্ত ঐ ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল হয়নি।

আমি ১৯৫৪ সাল থেকে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। ১৯৭১ সালে উপলব্ধি করলাম যে, সকল ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধ না হলে দীনের বিজয় কিছুতেই সম্ভব হবে না। এরই ফলে আমি ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ইসলামী ঐক্যের জন্যও যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি।

আল হামদুলিল্লাহ, ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে যতটুকু তাওফীক আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন, তাতে আমি মনকে প্রবোধ দেওয়ার মতো সাফল্য অনুভব করছি। কিন্তু সেই সাথে ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার জন্য হতাশা ভোগ করছি।

মুসলিম জনতা ইসলামী ঐক্যের জন্য পাগল। দেশে ইসলামী ময়দানে ৮/১০ জন এমন ব্যক্তি আছেন, যাঁরা একমঞ্চে সমবেত হওয়ার ফায়সালা করলেই ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল হতে পারে। কেন তাঁরা এ ফায়সালা করতে সক্ষম হচ্ছেন না তা এই বইটি থেকে ধারণা করা যেতে পারে। মৃত্যুর পূর্বে ইসলামী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ দেখে যেতে পারব কিনা জানি না। তবে আমি অব্যাহতভাবে দুআ করছি, যেন আশার আলো দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি।

গোলাম আযম

জানুয়ারি, ২০০৬

www.icsbook.info

www.icsbook.info

# সূচিপত্র


ইসলামী ঐক্য আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আবেগের বিষয় ১১
রমযানে প্রথম ই'তিকাফের সুযোগ ১২
'ইসলামী ঐক্য : ইসলামী আন্দোলন' পুস্তক রচনা ১২
ইসলামী ঐক্য ফর্মুলার সারকথা ১২
এ ফর্মুলার পেছনের মূল পরিকল্পনা ১৪
ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার উদ্যোগ ১৭
বই বিলির ব্যবস্থা হলো ১৭
সাড়া পাওয়া গেল ১৯
কমিটি গঠিত হলো ১৯
সম্মেলনের প্রস্তুতি ২০
'ইত্তেহাদুল উম্মাহ'র প্রতিষ্ঠা সম্মেলন ২১
ঐতিহাসিক উদ্বোধনী ভাষণ ২১
'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ' এক ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যমঞ্চ ২৩
কেন্দ্রীয় মজলিসে সাদারাতের সদস্যবৃন্দ ২৩
সম্মেলনে যারা বক্তব্য রাখেন ২৫
ইত্তেহাদুল উম্মাহর কর্মসূচি ২৫
প্রাথমিক পাঁচ দফা কর্মসূচি ২৬
ইত্তেহাদুল উম্মাহর মূলনীতি ২৭
১. ব্যাপক ঐক্য সম্পর্কে মূলনীতি ২৭
২. ইত্তেহাদুল উম্মাহর নেতৃত্বের ব্যাপারে মূলনীতি ২৭
৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে মূলনীতি ২৮
৪. বিভিন্ন মত, পথ ও দলের মর্যাদা সম্পর্কে মূলনীতি ২৮
৫. রাজনৈতিক বিষয়ে মূলনীতি ২৮
সম্মেলনের সাফল্যে পরম তৃপ্তিবোধ করলাম ২৮
মাওলানা সাঈদীর বিশেষ বিবরণ ২৯
ইত্তেহাদুল উম্মাহর অগ্রগতি ৩০
ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন ৩২
হাফেযজী হুজুরের সাথে আমার সাক্ষাতের চেষ্টা ৩৩
হাফেযজী হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ ৩৩
আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে গেল ৩৫
ইত্তেহাদুল উম্মাহ কীভাবে ভেঙে যাওয়ার সূচনা হলো? ৩৬


www.icsbook.info

মাওলানা সাঈদী সাহেবকে আন্দোলনের নেত
তাঁদে
তাঁদের নিয়ত সম্পর্কে আমি
বিষয়টা আমরা বিলম্বে জ
ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রেস ৩৯
পরের দিনে ৪০
পরিণামে ইত্তেহাদুল উম্মাহ অচল হ ৪২
'ইসলামী ঐক্য' ময়দানের ...বি ৪৩
বৃহত্তর ঐক্যের নতুন উদ্যোগ ৪৪
শীর্ষ সম্মেলনের বিবরণ ৪৪
সভাপতির মন্তব্য ৪৬
চরমোনাইর পীর সাহেব আমার বাড়িতে এলেন ৪৭
কারাগারে বন্দী থেকেও ইসলামী ঐক্যের প্রচেষ্টা ৪৮
ইসলামী শক্তির ঐক্যমঞ্চ চাই ৪৯
ঐক্যমঞ্চের উদাহরণ ৫০
ইসলামী ঐক্যের দু'দফা কর্মসূচি ৫১
ঐক্যপ্রচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য ৫২
ইসলামী ঐক্যের বাস্তব ফর্মুলা ৫৩
ঐক্যমঞ্চের বিকল্প ঐক্য পদ্ধতি ৫৩
চরমোনাইর মুহতারাম পীর সাহেবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ৫৩
ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় আলেমগণকে চিঠি ৫৬
আমার চিঠির জবাব ৫৭
তাঁদের চিঠির জবাব ৫৯
আমার চিঠির পর- ৬০
চরমোনাইর পীর সাহেবের জামায়াতবিরোধী অভিযান ৬১
কায়েদ সাহেব ও মুফতী সাঈদ আহমদের ঐক্যপ্রচেষ্টা ৬২
এক বৈঠকে আমার যোগদান ৬৩
পীর সাহেবের একতরফা চ্যালেঞ্জ ৬৩
দারুস্ সালামের বৈঠকের পর ৬৪
ড. মুস্তাফিজুর রহমানের চিঠি ৬৫
ড. মুস্তাফিজকে লেখা জবাব ৬৬
ড. মুস্তাফিজুর রহমানের হতাশাব্যঞ্জক ফোন ৬৭
মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদীর প্রচেষ্টা ৬৭
আরও কয়েকজনকে ঐক্যের উদ্দেশ্যে চিঠি ৬৮

www.icsbook.info

এসব চিঠি লেখার পটভূমি ৬৯
ঝালকাঠির দ্বিতীয় সম্মেলন ৭০
সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলি ৭১
কতিপয় ইস্যুর উপর দস্তখত সংগ্রহ অভিযান ৭২
দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী নেতৃবৃন্দের আবেদন ৭২
আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীগণ ৭৪
ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে বাইতুল মুকাররমের খতীব সাহেবের প্রচেষ্টা ৭৬
ঐক্যপ্রচেষ্টার নতুন উদ্যোগ ৭৭
জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক কমিটি ৭৮
লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যবৃন্দ ৭৯
নতুন ঐক্যপ্রচেষ্টায় ফুরফুরার পীর সাহেবের অব্যাহত অবদান ৭৯
জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ২০০৩ সালের বার্ষিক সম্মেলন ৮০
মজলিসে আমেলার সদস্যগণ ৮১
জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পরবর্তী সম্মেলন ৮৪
জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলই সর্বদলীয় একমাত্র ঐক্যমঞ্চ ৮৫
ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যোগাযোগ-প্রচেষ্টা ৮৬
বিএনপির সাথে যোগাযোগের সূচনা ৮৭
শাইখুল হাদীসের সাথে প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ ৮৭
যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব ৮৮
শাইখুল হাদীসের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ৮৯
সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যের প্রচেষ্টা ৯০
পাকিস্তানে ইসলামী ঐক্যের সুফল ৯১
বাংলাদেশে কি পাকিস্তানের স্টাইলে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়? ৯২
জামায়াতে ইসলামীর সাথে ঐক্য স্থাপনে আপত্তি ৯৩
ইসলামী দলগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে কেন? ৯৩
জামায়াতকে বাদ দিয়ে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা! ৯৪
ইসলামী ঐক্যজোট ভাঙনের নেপথ্যে ৯৫
মাওলানা আমিনী জামায়াতবিরোধী কেন? ৯৬
কাওমী মাদরাসার নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ৯৭
এ ফতোয়াবাজির পটভূমি ৯৯
একটা বড় উদাহরণ ১০০
ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ফেতনাবাজ আলেমদের একই ভূমিকা ১০১
সাধারণ জনগণের কাছে আলেম সমাজই দীনী ইলমের উৎস ১০২
ইংরেজ আমলে মাদরাসার মান ১০৩

www.icsbook.info

আমার দীনী জিন্দেগী গড়ার কাহিনী ১০৫
তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের অবদান ১০৬
জামায়াতে ইসলামীতে এসে যা শিখলাম ১০৬
কাওমী মাদরাসার আলেমগণের ভূমিকা ১০৮
তাঁদের প্রতি আমার দুটো আবেদন ১০৮
একটা সত্য ঘটনা ১০৯
বড় বড় আলেমগণের রাজনৈতিক ভূমিকা কী ছিল? ১১০
ওলামায়ে কেরাম ইকামাতে দীনের আন্দোলন করেননি কেন? ১১১
ইকামাতে দীন ও খিদমতে দীন ১১২
ইকামাতে দীন কি? ১১৩
হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন? ১১৩
দীনী খিদমতের সাথে এ সংঘর্ষ হয় না কেন? ১১৬
কয়েকটি ভুল ধারণা ১১৮
জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব ১২১
জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান ১২২
জামায়াতের সাথে কোনো কোনো ইসলামী দলের আচরণ ১২৪
মাওলানা মওদূদী (র)-বিরোধী ফতোয়া ১২৫
মাওলানা ফরিদপুরীর বই সম্পর্কে মাওলানা ইউসুফ ১২৯
কাওমী মাদরাসার উস্তাদগণের প্রতি আবেদন ১৩২
মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মূল্যায়ন ১৩৩
শায়খ ড. ইউসুফ আল কারদাভী ১৩৪
রাশেদ আল গানুশী ১৩৫
মুস্তাফা মুহাম্মদ তাহ্যান ১৩৬
আয়াতুল্লাহ তাসখীরী ১৩৭
ডাক্তার তোয়াহা রামলী ১৩৮
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক মাদানী ১৩৯
আমার মনে বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি হলো ১৩৯
আরও একটা প্রশ্ন ১৪০
ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না কেন? ১৪০
ইসলামী দল ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর নীতি ১৪১
এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর দৃঢ়তা ১৪২
জামায়াতে ইসলামীকে কি দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব? ১৪৩
আশার আলো ১৪৩


www.icsbook.info

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

## ইসলামী ঐক্য আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আবেগের বিষয়

আমি আমার বাধ্যতামূলক সাড়ে ছয় বছরের প্রবাস জীবনে একটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমাদের জন্মভূমিতে বিরাট ইসলামী শক্তি রয়েছে। মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। কয়েক লাখ আলেম জনগণের মধ্যে ঐসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দীনের খিদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। মসজিদের মুসল্লী, মাদরাসার ছাত্র, খানকার মুরীদ, ওয়ায-মাহফিলের শ্রোতা ও তাবলীগের ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীরা সম্মিলিতভাবে ইসলামের পক্ষে এক বিরাট শক্তি। কিন্তু দীনের এই খাদিমগণের মধ্যে কোনো ঐক্যবদ্ধ সংগঠন না থাকায় তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন রয়েছেন। তাই এই শক্তি কোনো কাজে আসছে না।

আরও দুঃখের বিষয়, দীনের এই খাদিমগণের মধ্যে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ববোধেরও অভাব রয়েছে। এরই ফলে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বেদীনদের নেতৃত্বই কায়েম রয়েছে।

দীনকে বিজয়ী করতে হলে বিচ্ছিন্ন ইসলামী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কীভাবে এ ঐক্য গড়া যায় এবং কী পদ্ধতি অবলম্বন করলে দীনের খাদিমগণকে এক মঞ্চে সমবেত করা যায়, এ বিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআও করতে থাকি। ১৯৭২ সাল থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই হজ্জের সময় মক্কা ও মদীনা শরীফে হাজির হই এবং দুআ কবুলের স্থানগুলোতে দুআ করতে থাকি; যাতে ইসলামী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো ফর্মুলা আমার মন-মগজে আসে। বিশেষ করে '৭৬ সালে মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীতে 'রাওযাতুল জান্নাত' (বেহেশতের বাগান) নামক স্থানে একাধারে কয়েক দিন আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে থাকি। ক্রমে ক্রমে ইসলামী ঐক্যের একটা ফর্মুলা আমার বুঝে আসে।

১৯৭৭ সালে লন্ডনে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে দেখা হলে ঐ ফর্মুলাটি সম্পর্কে তার সাথে আলোচনা করি। তিনি উৎসাহের সাথে তা পছন্দ করলেন। তখন আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, আপনার মাহফিলসমূহে বহু আলেম উপস্থিত থাকেন। সম্ভব হলে আপনি মাহফিলের শেষে আলেমগণের সাথে বৈঠক করে এ ফর্মুলা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন।



www.icsbook.info

## রমযানে প্রথম ই'তিকাফের সুযোগ

১৯৭৮ সালের আগস্টে রমযান মাস এল। তখন আমার তেমন কোনো কর্মব্যস্ততা ছিল না। তাই ই'তিকাফ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। পাকিস্তান আমলে অনেকবারই ই'তিকাফের কামনা করেছি; কিন্তু তখন জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক উভয় রকম দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হতো বলে এজন্য সময় বের করা সম্ভব হয়নি। '৭৮-এ কোনো দায়িত্বই না থাকায় ই'তিকাফ করা সহজ হয়ে গেল। এটাই আমার জীবনে প্রথম বারের ই'তিকাফ।

## 'ইসলামী ঐক্য : ইসলামী আন্দোলন' পুস্তক রচনা

'৭৮ সালে দেশে ফিরে এসে ইসলামী ঐক্যের সেই ফর্মুলা সম্পর্কে আরও চিন্তা-ভাবনা করে মনে এ বিষয়ে এতমিনান বোধ করেছি। তাই ই'তিকাফে থেকেই ঐ ফর্মুলাটি লিখিত আকারে তৈরি করে ফেলি এবং '৭৮-এর নভেম্বর মাসেই 'ইসলামী আন্দোলন' নামে তা প্রকাশিত হয়। এর পরের বছরের নভেম্বর থেকে বইটি 'ইসলামী ঐক্য : ইসলামী আন্দোলন' নামে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে বইটির মুদ্রণ সংখ্যা ১১-তে পৌঁছেছে। ইসলামী ঐক্য সবারই কামনা। তাই বইটির চাহিদা এখনও শেষ হচ্ছে না।

এ বইটি দিয়েই ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা শুরু হলো। প্রথমে তা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম (মরহুম), মাওলানা সাইয়েদ কামালউদ্দিন জাফরী ও আজিমপুর গোরস্থান শাহী মসজিদের খতীব ও মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহকে দিলাম। চট্টগ্রামে বাইতুশ শরফের পীর মাওলানা আবদুল জব্বারের নিকটও তা পাঠালাম। চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফযলুল করীমের নিকটও তাঁর ভগ্নিপতি মাওলানা বেলায়েত হোসেনের মাধ্যমে পাঠালাম। টঙ্গীতে তাবলীগ জামায়াতের ইজতেমায় গিয়ে তাবলীগের আমীর মাওলামা আবদুল আযীযের হাতেও দিলাম। সিলেটের গৌরিয়ার শায়খ মাওলানা আবদুল করীমের বাসায় গিয়ে তার খিদমতেও তা পেশ করলাম।

## ইসলামী ঐক্য ফর্মুলার সারকথা

১. প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, দীনের সকল খিদমতের গুরুত্ব প্রত্যেক খাদিমকেই স্বীকার করতে হবে। সাধারণত দেখা যায়, যারা দীনের যে ধরনের খিদমত করেন তারা নিজেদের খিদমতের গুরুত্ব খুবই উপলব্ধি করেন, কিন্তু অন্যান্য ধরনের খিদমতকে স্বীকৃতি দিতে চান না। যেমন– কাওমী মাদরাসার কোনো কোনো খাদিম আলিয়া মাদরাসার খিদমতকে নগণ্য মনে করেন। তাবলীগ জামায়াতের কেউ কেউ তাদের কাজকে 'নবীওয়ালা' কাজ বলে গণ্য করেন, কিন্তু অন্যান্য খিদমতকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না।



www.icsbook.info

তাই আমার লেখা বইটিতে যেমন মক্তবের খিদমতের গুরুত্ব তুলে ধরেছি, ফোরকানিয়া, হাফেযী, কাওমী ও আলিয়া মাদরাসাসমূহের খিদমত সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছি— তেমনি মসজিদ, খানকাহ (পীর-মুরীদী), ওয়ায-নসীহত, ইসলামী সাহিত্য রচনা ও প্রকাশ, তাবলীগ জামায়াত, ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ, স্থানীয় বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান, ইসলামী ছাত্রসংগঠন ইত্যাদি দ্বারা যেসব খিদমত হচ্ছে তাও আলাদা আলাদাভাবে লিখেছি।

দীনের সকল প্রকার খাদিমগণ যদি সব রকম খিদমতকে স্বীকৃতি দেন তাহলে তাদের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব গড়ে উঠবে, তারা উপলব্ধি করবেন যে, তারা সবাই বিভিন্নভাবে একই দীনের খিদমত করছেন এবং সকল রকম খিদমতই একটি অপরটির সহায়ক ও পরিপূরক।

২. বিভিন্ন ধরনের খিদমতে দীনের দায়িত্বশীলগণের নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পর্যায়ে সংগঠন কায়েম করতে হবে। পরে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এর শাখা কায়েম করা হবে।

৩. এ ধরনের সংগঠন কায়েমের পথে বড় বাধা হল ব্যক্তিগত নেতৃত্ব। কোনো একজনকে সভাপতি বা সেক্রেটারি করতে চাইলে নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা হতে পারে এবং এ বিষয়ে কোন্দল সৃষ্টি হয়ে সংগঠন ভেঙে যেতে পারে। তাই কোনো এক ব্যক্তিকে সভাপতি না করে সামষ্টিক নেতৃত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে প্রধান দায়িত্বশীলগণকে নিয়ে মজলিসে সাদারাত (সভাপতিমণ্ডলী) গঠন করতে হবে। সংগঠনের প্রথম বৈঠকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সভাপতিত্ব করবেন। পরবর্তী বৈঠকসমূহে মজলিসে সাদারাতের সদস্যগণ পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করবেন।

৪. মজলিসে সাদারাতে খিদমতে দীনের যেসব প্রতিনিধি থাকবেন তাদের থেকেই একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হবে। বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের শাখা কায়েম করার দায়িত্ব তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে সংগঠন দ্রুত সম্প্রসারিত হতে পারে।

৫. মজলিসে সাদারাতের প্রধান দায়িত্ব নিম্নরূপ :

ক. ইসলামী ঐক্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য সকল ধরনের খাদিমে-দীনকে সংগঠনভুক্ত করা।

খ. জনগণকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় হেদায়াত ও নসীহত করা।

গ. সরকারকে ইসলামের পক্ষে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।



www.icsbook.info

ঘ. ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো।

ঙ. ইসলামের খাদিমগণের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তাদের মধ্যে সমঝোতার ব্যবস্থা করা।

৬. মজলিসে সাদারাতের সদস্যদের সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৭. এ সংগঠন কোনো রাজনৈতিক দলের মতো ভূমিকা পালন করবে না এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনো রাজনৈতিক ইস্যুতেও মতামত ব্যক্ত করবে না।

এ ফর্মুলা অনুযায়ী যেকোনো নামে সংগঠন চালু হতে পারে। সংগঠনের নামও সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই বাছাই করতে হবে।

## এ ফর্মুলার পেছনের মূল পরিকল্পনা

'ইত্তেহাদুল উম্মাহ'কে অরাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে তার মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল না হয়। বর্তমান চারদলীয় জোটের শরীক ইসলামী ঐক্যজোট নেতৃত্বের কোন্দলে ২০০১ সালের নির্বাচনের পরপরই দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ বছরের (২০০৫) শুরুতে মুফতী আমিনী গ্রুপের মহাসচিব মাওলানা ইযহারুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে তৃতীয় আরেকটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়। এ বছর মে মাসে শাইখুল হাদীস গ্রুপ থেকে খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা ইসহাকের নেতৃত্বে ঐক্যজোটের ৪র্থ গ্রুপ জন্মলাভ করে। গত বছর (২০০৪ সালে) নেযামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মাওলানা ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী মূল পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার সভাপতিত্বে পৃথক নেযামে ইসলাম পার্টি গঠন করেন। 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' নামের ছোট দলটি দু'বছর আগেই (২০০৩) দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হাফেযজী হুযুরের প্রতিষ্ঠিত 'খেলাফত আন্দোলন'ও গত মাসে (জুন ২০০৫) দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।

এ জাতীয় কোন্দলের কারণে যাতে ইত্তেহাদুল উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট না হয়, সেজন্য সংস্থাটিকে অরাজনৈতিক রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকে যে নেতৃবৃন্দ এতে শরীক আছেন, তাদের কোনো একজনকে সংগঠনের সভাপতি বানালে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে 'মজলিসে সাদারাত' (সভাপতিমণ্ডলী) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আমার আশা ছিল, ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্লাটফরমে জামায়াতের লোকদের সাথে অন্যান্য মহলের দীনী খাদেমগণের উঠা-বসা অব্যাহত থাকলে জামায়াত সম্পর্কে তাদের কারো কারো মনে যে ভুল ধারণা বিরাজ করছে তা ক্রমে দূর হতে থাকবে।



www.icsbook.info

দীনের মৌলিক বিষয়ে মজলিসে সাদারাতের সদস্যগণের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যাতে চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি হয়, সেজন্যও কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। মগবাজারের কাছে দিলু রোডে ইত্তেহাদুল উম্মাহর অফিসে ৩০/৪০ জনের বৈঠক হওয়ার মতো একটি প্রশস্ত কামরা ছিল। সম্ভবত ১৯৮৪ সালে উক্ত কামরায় তিন দিনব্যাপী এক আলোচনা বৈঠক হয়। বৈঠকে এমন তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, যা চিন্তার ঐক্য সাধনে অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হয়। যেমন–

১. রাসূল (স)-এর সর্বপ্রধান দায়িত্ব কী ছিল?

২. খিদমতে দীনই কি যথেষ্ট, না ইকামাতে দীনও জরুরি?

৩. রাসূল (স)-এর দীনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অনুসরণযোগ্য কারা?

এ আলোচনায় 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ'তে সক্রিয় পীর সাহেবান ও আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় জামাআতের কয়েকজন যুবক আলেমকে শরীক হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাদের ইলমী ও যৌক্তিক আলোচনা সবাই পছন্দ করেন।

প্রথম বিষয়টির আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয় যে, দীন ইসলামকে অন্যসব জীবনবিধানের ওপর বিজয়ী করাই রাসূল (স)-এর আসল দায়িত্ব ছিল। তাই এ দায়িত্ব পালন করা উম্মতেরও প্রধান কর্তব্য।

দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনায় সবাই স্বীকার করেন যে, মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে দীনের বড় বড় খিদমত হলেও নায়েবে রাসূল হিসেবে আলেম সমাজের জন্য শুধু খিদমতে দীনই যথেষ্ট নয়; বরং দীন কায়েমের দায়িত্ব পালন করাও তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

তৃতীয় বিষয়টির আলোচনায় এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যারা সরাসরি রাসূল (স)-এর সাথী হিসেবে তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন, তাঁরাই আমাদের আসল আদর্শ। কেননা তাঁরাই সঠিকভাবে রাসূল (স)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেছেন। বিশেষভাবে প্রথম চার খলীফা হচ্ছেন রাসূল (স)-এর পর উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ দীনী ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীকালের কোনো ব্যক্তিত্বকে যত বড়ই মনে করা হোক, ঐ চার জনের সাথে তুলনা করার যোগ্য আর কেউ হতে পারেন না।

আমাদের দেশে যারা ব্যাপকভাবে গাউসুল আযম বড় পীর ও খাজা বাবাকে মানতে গিয়ে বহু বিদআতে লিপ্ত আছে, তারা এ আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে, ঐ চার খলীফার চর্চাই তাদের কাছে অধিক প্রয়োজনীয় মনে হবে।

আমি মজলিসে সাদারাতের সদস্য ছিলাম না। কিন্তু ঐ আলোচনায় আমি অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। এ তিন দিনের আলোচনার এক ফাঁকে আমি একটি জরুরি বিষয়ে আলোচনা রেখে উপস্থিত পীর সাহেবান ও আলেমগণের অভিমত কামনা করলে তাদের কেউই আমার কথায় দ্বিমত প্রকাশ করেননি।



www.icsbook.info

বিষয়টি ছিল মাদরাসা ও খানকাহ সম্পর্কে। আমি বললাম, আমাদের দেশে যে মাদরাসা ও খানকাহ রয়েছে এ বিষয়ে হয়তো কেউ বলতে পারেন, রাসূল (স) এ ধরনের কোনো মাদরাসা ও খানকাহ কায়েম করেননি, তাই এসব বিদআত। আমি তাদের এ মত কিছুতেই সমর্থন করি না।

রাসূল (স) দীনের ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। দীনের ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যেই তো মাদরাসা কায়েম করা হয়। তাই এটাকে বিদআত বলা অন্যায়। কিন্তু যদি কেউ এ কথা দাবি করেন যে– মাদরাসায় না পড়লে আলেম হওয়া যায় না, তাহলে এ দাবিটি বিদআত। কারণ মাদরাসায় না পড়েও সাহাবায়ে কেরাম দীনের আলেম ছিলেন। তাঁরা ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে দীনের ইলম হাসিল করেছিলেন। আজও ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে দীনের ইলম হাসিল করা সম্ভব। তাই এ ধারণা ঠিক নয় যে, মাদরাসায় পড়া ব্যতীত দীনের ইলম হাসিল করা যায় না। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহর, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ মাদরাসায় শিক্ষালাভ না করলেও বড় আলেম হিসেবে স্বীকৃত।

খানকাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও আল্লাহর মহব্বত শিক্ষা দেওয়া। 'তাকাররুব ইলাল্লাহ' বা 'ইনাবাত ইলাল্লাহ' হাসিল করার উদ্দেশ্যেই মানুষ পীরের খানকায় যায়। রাসূল (স) ঠিক এ ধরনের খানকাহ কায়েম না করলেও আমি খানকাহকে বিদআত মনে করি না। কিন্তু যদি এ দাবি করা হয় যে, পীর না ধরলে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায় না, তাহলে এ দাবিটি অবশ্যই বিদআত। যারা দীন কায়েমের জন্য জান-মাল কুরবানী দিচ্ছে, বাতিলের নির্যাতন সত্ত্বেও দমে যাচ্ছে না, তারা আল্লাহর নৈকট্যবোধ না করলে এ পথে টিকে থাকতে পারত না। দীনের কারণে যারা জেলে যায়, তারা সেখানে আল্লাহকেই কাছে পেয়ে সান্ত্বনাবোধ করে। তাই পীরের মুরীদ না হয়েও আল্লাহওয়ালা হওয়া যেতে পারে।

আমার বড় আশা ছিল যে, ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাধ্যমে জামায়াতের লোকেরা অন্যান্য দীনী মহলের ভাইদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেলে দীনের ভিত্তিতে তাদের পারস্পরিক মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। হয়তো এক সময় মজলিসে সাদারাতের সবাই একমত হয়ে দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতেও সক্ষম হবেন। যারা দীনকে শুধু ধর্ম মনে করেন তারাও বুঝতে পারবেন যে, রাসূল (স) যদি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা জরুরি মনে করে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশেও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা ফরয। যারা যিকর-আযকারের গুরুত্ব বোঝেন, তারাও আল্লাহর আইন সমাজে চালু করা কর্তব্য বলে মনে করবেন। এভাবেই সকল দীনী মহলের মধ্যে চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি হবে বলে আমি আশা করছিলাম।



www.icsbook.info

## ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার উদ্যোগ

বিশিষ্ট ওলামা-মাশায়েখের নিকট 'ইসলামী ঐক্য : ইসলামী আন্দোলন' পুস্তিকাটি পৌছানোর জন্য এমন একজন আলেমকে মনে মনে তালাশ করছিলাম, যিনি সারা দেশ সফর করার মতো সময় দিতে পারবেন। কিছু দিন পরই চাঁদপুর জেলার হাইমচর থানার মাওলানা আবদুল মজীদ আমার কাছে আসেন। পাকিস্তান আমলে তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিল। অনেক বছর পর তাঁকে দেখে খুশি হলাম। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেছিলেন। মাওলানা সাহেব বললেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখে আপনার সাথে দেখা করতে বাধ্য হলাম। আমি উৎসুক ও বিস্মিত হয়ে তার কাছে ঐ স্বপ্নের বিবরণ জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন, স্বপ্নে মাওলানা মওদূদী (র)-এর সাথে আমার দেখা। মাওলানা সাহেব আমাকে হুকুম দিলেন, "সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন।" এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি? এটা তো এমন একটা বিরাট কাজ, যা আমার সাধ্যের বাইরে। তাই আপনার কাছে এলাম।

আমি আনন্দের সাথে তাঁর সাথে কোলাকুলি করে বললাম, আপনার মতো একজন লোকই আমি কামনা করছিলাম। মনে হয় আল্লাহ তাআলাই আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি আমার অতি প্রয়োজনীয় মেহমান।

'ইসলামী ঐক্য : ইসলামী আন্দোলন' পুস্তিকাটি তাঁকে পড়তে দিলাম। তিনি আবেগপ্রবণ মানুষ। বইটি পড়ে তিনি আনন্দের আতিশয্যে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার স্বপ্ন সার্থক। আমি বললাম, যথাসময়েই আপনি হাজির হয়েছেন। যদি বই প্রকাশের পূর্বে আসতেন তাহলে আপনাকে কোনো দায়িত্ব দিতে পারতাম না। আলহামদুলিল্লাহ, আপনি এমন সময়ে হাজির হয়েছেন, যখন আপনার জন্য কাজ একেবারে রেডি।

## বই বিলির ব্যবস্থা হলো

তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে এ দায়িত্ব পালনে রাজি হলেন এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে বিশিষ্ট ওলামা ও মাশায়েখের নিকট বইটি পৌছানোর কাজে নিয়োজিত হলেন। শুধু যাতায়াত খরচ নিয়েই তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

কিছু দিন পর জানা গেল, কাওমী মাদরাসার আলেমগণের সাথে তাদের মধ্য থেকে কোনো আলেম যোগাযোগ না করলে এ ব্যাপারে সাড়া পাওয়ার আশা করা যায় না। আল্লাহর মেহেরবানীতে এমন একজন আলেমও পাওয়া গেল। একদিন মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম ফোনে আমাকে জানালেন, কাওমী মাদরাসার একজন যোগ্য আলেম পাওয়া গেছে, যিনি ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। আমি এক ওয়াজের মাহফিলে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থানায় গিয়েছিলাম। সেখানে তিনি আমাকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন, 'পাকিস্তান আমলে আপনি ইসলামী



www.icsbook.info

সংগ্রাম পরিষদের নেতা ছিলেন। ইসলাম কি কায়েম হয়ে গিয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এখন সংগ্রাম নেই কেন?' তাঁর কথায় আমি বুঝতে পারলাম, যে উদ্দেশ্যে আপনি কাওমী লাইনের একজন আলেম তালাশ করছেন, এর জন্য তিনিই হবেন যোগ্য ব্যক্তি। তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে সাথে নিয়ে এসেছি। মাওলানা মাসুম চমৎকার রসিকতার সাথে কথা বলতেন। আমি তাঁকে বললাম, এখনই 'আসামি'কে আমার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন।

মাওলানা মাসুম খুবই গতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। একটি ছোট্ট মোটর গাড়ি নিজেই চালাতেন। তাঁর গাড়িতেই তিনি আসামিকে নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির হলেন। আমার সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, ইনি মাওলানা মাযহারুল হক, দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা হোসাইন আহমদের সরাসরি শাগরিদ। তিনি প্রখ্যাত কারী ইবরাহীম (র)-এর প্রতিষ্ঠিত উযানী কাওমী মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে নেযামে ইসলাম পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় আইন-পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

তাঁর এ পরিচয় পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তাঁর সাথে কোলাকুলি করলাম। মাওলানা মাসুমের উপস্থিতিতেই তাঁকে বললাম, ইসলামী ঐক্যের পক্ষে আপনার জযবার কথা জেনে অত্যন্ত খুশি হলাম।

১৯৭০-এর নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ও নেযামে ইসলাম পার্টির মধ্যে এ সমঝোতা হয়েছিল যে, নির্বাচনে একই আসনে এ দু'দলের প্রার্থী দেওয়া হবে না এবং উভয় দলের লোকই এ দু'দলের প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনে কাজ করবে। এদিক দিয়ে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই মনে করি।

কিন্তু জামায়াতে ইসলামীসহ দেশের সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যের উদ্দেশ্যে আপনি যখন কাওমী ওলামা-মাশায়েখের সাথে যোগাযোগ করবেন, তখন হয় তো জামায়াত ও মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে কতক প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। আপনার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা মাদানী (র)-সহ আরও কতক ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য রয়েছে; যা হয়তো আপনার জানা আছে। মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা তাই স্বাভাবিকভাবেই জামায়াত মাওলানার রচিত তাফসীর, সীরাত ও বিরাট ইসলামী সাহিত্য প্রচার করে থাকে। আপনি যাদের সাথে ঐক্যের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করবেন তারা অবশ্যই এ ব্যাপারে আপত্তি তুলবেন। তাই তাদের সাথে যোগাযোগ শুরুর পূর্বে আপনি মাওলানা মওদূদীর রচিত সাহিত্য ভালোভাবে পড়ে দেখুন। আমার নিকট উর্দু ভাষায় মাওলানার লেখা সকল বই-ই আছে।



www.icsbook.info

আপনি আমার বাড়িতে মেহমান হিসেবে থাকুন। মাওলানা মওদূদীর সকল বইই আপনার সামনে হাজির থাকবে। ধীরে-সুস্থে আপনি সেগুলো পড়ে যখন ওলামায়ে কেরামের প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাবদানে নিজেকে সক্ষম বলে মনে করবেন, তখনই যোগাযোগ শুরু করবেন। তিনি আমার এ প্রস্তাব কবুল করলেন।

তিনি রাতদিন বইগুলো দেখতে থাকলেন। বিশেষ করে রাসায়েল ও মাসায়েলের সব কয়টি খণ্ড ঘাঁটাঘাঁটি করে চার দিন পরই তিনি জানালেন, আমার এতমিনান হয়ে গেছে। যে কয়টি আপত্তির কথা এ পর্যন্ত শুনেছি সে কয়টিতে এতমিনান হওয়ার পর আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করাটা প্রয়োজনীয় মনে করি না।

## সাড়া পাওয়া গেল

মাওলানা আবদুল মজিদ ও মাওলানা মাযহারুল হক আমার লেখা বইটি নিয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ করতে লাগলেন। আমি যাদেরকে বইটি দিয়েছি তাঁদের মধ্যে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে তো ১৯৭৭ সালে লন্ডনেই এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাই তিনি বই পড়ার আগে থেকেই ঐক্যপ্রচেষ্টার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম ও মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরীও আগ্রহী হলেন। চট্টগ্রামের বাইতুশ শরফের পীর মাওলানা আবদুল জব্বারও সাড়া দিলেন।

১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে হঠাৎ বিনাখবরে চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিল না। তাঁর মরহুম আব্বা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাকের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে তাঁর সভাপতিত্বে বেশ কয়েকটি সভায় আমি বক্তৃতা করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি মাওলানা আবদুর রহীমের পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে একটি লঞ্চ দিয়ে সাহায্য করেন।

পীর সাহেবের আগমনে আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ করলাম এবং তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। বললাম, কোনো খবর না দিয়েই চলে এলেন? তিনি বললেন, আপনার বইটি পড়ে আসতে বাধ্য হলাম। আপনার সাথে আমার চিন্তার মিল হয়েছে। সকল ইসলামী শক্তিকে একমঞ্চে একত্রিত করার যে ফর্মুলা আপনি পেশ করেছেন, তা আমার পছন্দ হয়েছে। আমি বললাম, আমি তো প্রস্তাবক মাত্র। যারা ইসলামী ঐক্যের এ ফর্মুলা পছন্দ করেন, তারা একটি কমিটি গঠন করে ঐক্য প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন। আমি পূর্ণ সহযোগিতা করব, ইনশাআল্লাহ।

## কমিটি গঠিত হলো

১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুমকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠিত হয়। মাওলানা সাঈদী, মাওলানা জাফরী, মাওলানা আবদুল্লাহ, বাইতুশ



www.icsbook.info

শরফের পীর সাহেব, চরমোনাইর পীর সাহেব এবং যোগাযোগকারী দু'জন– মাওলানা আবদুল মজীদ ও মাওলানা মাযহারুল হক প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ কমিটির সদস্য হন।

কয়েক মাস পরপর যখন কমিটির বৈঠক হতো তখন আমাকেও আলোচনায় শরীক করা হয়; যদিও আমি কমিটির সদস্য ছিলাম না। ক্রমে ক্রমে কমিটির সদস্যসংখ্যা বাড়তে থাকে। যোগাযোগকারীগণ কীরূপ সাড়া পাচ্ছেন, সে সম্পর্কে কমিটির বৈঠকে রিপোর্ট করতে থাকেন।

কমিটি ১৯৮০ সালের শেষ দিকে সম্মেলন আহ্বান করার চিন্তা শুরু করে। আমি পরামর্শ দিলাম, এ কাজটি তাড়াহুড়া করে করার মতো নয়। সকল মহলের সাথে যোগাযোগ করতে যদি কিছু বিলম্ব হয় তাতেও ক্ষতি নেই।

## সম্মেলনের প্রস্তুতি

১৯৭৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৮১ সালের মে মাস পর্যন্ত আড়াই বছর উল্লেখযোগ্য সকল মহলের সাথে যোগাযোগের পর ১০ জুন বাইতুশ শরফের পীর সাহেবের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট 'এন্তেজামিয়া কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটির উদ্যোগে ৬ আগস্ট (১৯৮১) ঢাকার টিএন্ডটি কলোনি মসজিদে সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম।

সভায় ইসলামী ঐক্যমঞ্চের নাম কী রাখা হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এটা শুধু 'আলেমগণের ঐক্য' নয়; বরং 'মুসলিম জনগণের ঐক্য' হওয়া উচিত। দীর্ঘ আলোচনার পর 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' নামটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ নামটির প্রস্তাবক ছিলেন অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক। তিনি জামায়াতের এক সময়ের রুকন, দৈনিক সংগ্রামের সাবেক সম্পাদক, বর্তমানে খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমীর।

ঐ দিনই (৬ আগস্ট '৮১) টিএন্ডটি কলোনি মসজিদে ৮৫ জন আলেম, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদের এক বৈঠকে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ' নামে একটি ব্যাপকভিত্তিক ইসলামী ঐক্য সংগঠন কায়েমের উদ্দেশ্যে ৬৪ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। আমি আগা-গোড়াই সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছি। আমি সংগঠকের ভূমিকা পালন করা সঠিক মনে করিনি। এ কাজটি ওলামা-মাশায়েখের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় হোক, এটাই আমার কামনা ছিল। এ কারণেই কোথাও কোনো কমিটিতে আমার নাম রাখা হয়নি। আমি একজন প্রস্তাবক, সহায়ক ও পরামর্শদাতার ভূমিকা পালনকারী হিসেবে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি।



www.icsbook.info

## ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রতিষ্ঠা সম্মেলন

১৯৮১ সালের ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর টিএন্ডটি কলোনি মসজিদে প্রায় ৩০০ জন আলেম, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ জাতীয় একটি সম্মেলনের স্থান নির্বাচন করা সহজ ছিল না। মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব লুৎফুর রহমান এবং মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা সিরাজুল ইসলামের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এমন একটি সম্মেলনের আয়োজন করা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম সভাপতিত্ব করেন এবং তিনিই উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন। এ ভাষণটি এন্তেজামিয়া কমিটির একান্ত প্রচেষ্টায় সর্বসম্মতভাবে প্রণীত হয়েছিল। সম্মেলনে উপস্থিত সবাই এ ভাষণের দ্বারা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হন। সকলের মধ্যে ঐক্যের পক্ষে গভীর জযবা ও পরম উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

## ঐতিহাসিক উদ্বোধনী ভাষণ

"বাংলাদেশে আল্লাহর রহমতে ইসলামী শক্তির মযবুত ভিত্তি রয়েছে। এ দেশে ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা কয়েক লাখ। হাজার হাজার মাদরাসার মাধ্যমে প্রতি বছর লাখ লাখ আলেম তৈরি হচ্ছে। এসব মাদরাসার সাথে মুসলিম জনগণের আর্থিক সহযোগিতা ও নৈতিক সমর্থন রয়েছে। অগণিত হাক্কানী পীর ও মাশায়েখের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষ আল্লাহ তাআলা ও রাসূল (স)-এর সাথে ঈমানী সম্পর্ক নিবিড় করার সুযোগ পাচ্ছে। বহুসংখ্যক যোগ্য ওয়ায়েয মারফত বিপুলসংখ্যক লোক ইসলামের বুনিয়াদী জ্ঞান ও জিহাদী জযবা হাসিল করছে। তাবলীগ জামায়াতের উসিলায় অগণিত লোক কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও নামায সহীহভাবে শেখার সাথে সাথে আখিরাতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রায় দু'লাখ মসজিদ দেশের কোটি কোটি তৌহিদী জনতার অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। মসজিদে মসজিদে কুরআনের তাফসীর চর্চা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। ইসলামী চেতনা জনগণের মধ্যে এ পরিমাণ রয়েছে যে, ইসলামবিরোধীরা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার সাহস পায় না।

কিন্তু এ দেশের ইসলামী শক্তি বিচ্ছিন্ন থাকায় ইসলামবিরোধীরা বিদেশী ভ্রান্ত মতবাদ ও অপসংস্কৃতি দ্বারা যুবসমাজকে কলুষিত করছে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মাদরাসা, মসজিদ, খানকাহ, ওয়ায, তাবলীগ, ইসলামী সাহিত্য, ইসলামী শাসন কায়েমের আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে যাঁরা নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী



www.icsbook.info

দীন-ইসলামের মহান খিদমত করছেন, তাঁদের ঐক্য ব্যতীত ইসলামের বিজয় কখনো সম্ভব নয়। এসব খিদমতে যাঁরা নিযুক্ত আছেন, তাদের এই খিদমতের কদর সবারই করা উচিত।

মাদরাসা আছে বলেই মসজিদ আবাদ আছে। ওয়ায, খানকাহ্ ও তাবলীগ আছে বলেই অশিক্ষিত জনগণের মধ্যেও ইসলামী জযবা কায়েম আছে। ইসলামী সাহিত্য বিদ্যমান থাকায় আধুনিক শিক্ষিত সমাজও ইসলামের আলো পাচ্ছে। তাই এ খিদমতগুলোর সবই পরস্পর পরিপূরক। এর কোনোটার গুরুত্বই কম নয়। সবার মিলিত খিদমতের ফলেই কুরআন ও সুন্নাহর আলো এখনো বেঁচে আছে।

মাদরাসা দ্বারা দীনের যে খিদমত হচ্ছে, তা তাবলীগ দ্বারা সম্ভব নয়। তাবলীগ জামায়াত জনগণের মধ্যে দীনের যে কাজ করছে, তা মাদরাসার পক্ষে এভাবে করা অসম্ভব। ওয়ায়েযের মাধ্যমে অশিক্ষিত জনগণের নিকট যতটুকু দীনী শিক্ষা পৌঁছতে পেরেছে তা ইসলামী সাহিত্য দ্বারা কখনও সম্ভব হতো না। তাই আসুন, আমরা সবাই সবার খিদমতকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করি। ইখলাসের সাথে যে যতটুকু কাজ করছেন, সেটুকুই আল্লাহ তাআলার নিকট মূল্যবান বলে গণ্য হবে। নিজের খিদমতকে বড় মনে করে অন্যদের খিদমতকে তুচ্ছ মনে করলে তাতে অহংকারই প্রকাশ পায়। আর অহংকারীর কোনো খিদমতই মনিবের দরবারে কবুল হয় না।

আজ আমরা উদার মন নিয়ে সবার দীনী খিদমতকে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমরা সবাই ইখলাসের সাথে উপলব্ধি করছি যে, এ সকল খিদমতই একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। সব খিদমত মিলেই দীনের বিরাট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এসব খিদমত একসাথে করার ক্ষমতা কারো নেই। আমরা সবাই বিভিন্নভাবে একই দীনের খিদমত করে যাচ্ছি। কোনো খিদমতকেই আমরা নগণ্য মনে করি না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের খিদমতই মহামূল্যবান।

বর্তমানে এ দেশে যাঁরা বিভিন্নভাবে দীনের খিদমত করছেন, তাদের কোনো ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ নেই বলে দেশের ইসলামী শক্তি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। উপরিউক্ত উদার মন নিয়ে সব খিদমতকে স্বীকার করে নিলে এসব বিচ্ছিন্ন শক্তিও ইনশাআল্লাহ এমন ঐক্যবদ্ধ মযবুত শক্তিতে পরিণত হবে, যা ইসলামের বিজয়কে নিশ্চিত করতে পারে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এমন নাজুক যে, ভারত বা রাশিয়া এ দেশকে আফগানিস্তানের মতো কুক্ষিগত করে নেওয়ার সুযোগ নিতে পারে। আফগানিস্তানের ইসলামী শক্তিগুলো দেশ থেকে হিজরত করে (১৯৮১ সাল) বিদেশে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার পুতুল বারবাক সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বাধ্য হয়েছে। এসব ইসলামী শক্তি আগেই যদি এমন ঐক্যবদ্ধ হতো, তাহলে হয়তো তাদের হিজরত করার কোনো দরকারই হতো না।



www.icsbook.info

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের কোনো ঐক্যশক্তি গড়ে উঠলে ইসলামের বিদেশী দুশমন ও দেশী মীরজাফররা এ দেশকে আফগানিস্তানের মতো দুর্দশায় ঠেলে দিতে পারবে না। কিন্তু 'খোদা না-খাস্তা' যদি ইসলামী ঐক্যের অভাবে এ দেশে সে জাতীয় কোনো বিপদ নেমে আসে, তাহলে আমরা আশে পাশে কোথাও কোনো আশ্রয় পাব না। তাই বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও ইসলামী ঐক্য অপরিহার্য।"

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ দীনের সকল খাদেমের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যারা সংকীর্ণ মনোভাবের কারণে শুধু নিজ নিজ খিদমতের গুরুত্বই বোঝেন, কিন্তু অন্যান্য খিদমতকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন না, এ ভাষণ তাদের সকলের মধ্যে উদার মনোভাবের জযবা এবং সম্মেলনের সকল ডেলিগেটের মধ্যে পরম ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলে। সকল ইসলামী মহল ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে সকল খাদেম পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে এক বিরাট শক্তিতে যে পরিণত হবে, একথা সবাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সম্মেলনে ইসলামী উখওয়াতের চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা সবাইকে আনন্দে আপ্লুত করে।

## 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ' এক ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যমঞ্চ

১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ' নামে যে ঐক্যমঞ্চ গঠিত হয় তাতে সকল দীনী মহল প্রথমে শামিল না হলেও এর পূর্বে এতটা ব্যাপক ঐক্য কখনো দেখা যায়নি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে সভাপতি ও সেক্রেটারি পদ না দিয়ে ঐক্যের স্বার্থেই বিভিন্ন মহলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে 'কেন্দ্রীয় মজলিসে সাদারাত' (সভাপতিমণ্ডলী বা সভাপতি পরিষদ) গঠন করা হয়। শুধু মজলিসে সাদারাতের বৈঠকে কোনো একজনকে সভাপতির আসনে বসিয়ে সভা পরিচালনা করা হয়। যারা ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশের মজলিসে সাদারাতের সদস্য হন, তাদের তালিকা থেকে এ ঐক্যমঞ্চটি কতটা ব্যাপকভিত্তিক ছিল, সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

## কেন্দ্রীয় মজলিসে সাদারাতের সদস্যবৃন্দ

১. মাওলানা সাইয়েদ আবদুল আহাদ আল্ মাদানী (আওলাদে রাসূল), চট্টগ্রাম।
২. খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ, নেজামে ইসলাম পার্টি।
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, পীর সাহেব, বায়তুশ্ শরফ, চট্টগ্রাম।
৪. মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ফজলুল করীম, পীর সাহেব, চরমোনাই, বরিশাল।
৫. মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ছিদ্দীক, পীর সাহেব, শর্ষিনা, বরিশাল।



www.icsbook.info

৬. মাওলানা সাইয়েদ মোসলেহ উদ্দীন, নেজামে ইসলাম পার্টি, কুমিল্লা।
৭. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মুফাসসিরে কুরআন, ঢাকা।
৮. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, প্রিন্সিপাল, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
৯. মাওলানা খাজা মুহাম্মদ সাঈদ শাহ্, পীর সাহেব, নওয়াপাড়া, যশোর।
১০. মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী, পীর সাহেব, সুইহারী, দিনাজপুর।
১১. মাওলানা মুহাম্মদ নজীবুল্লাহ্, প্রিন্সিপাল, মুস্তাফাবিয়া মাদরাসা, বগুড়া।
১২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, পীর সাহেব, গারাঙ্গীয়া, চট্টগ্রাম।
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ বশীরুল্লাহ আত্হারী, ইমাম, জামে-কসাই মসজিদ, বরিশাল।
১৪. মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম, মুফাসসিরে কুরআন, ঢাকা।
১৫. মাওলানা মুহাম্মদ ইছ্হাক, পাবনা।
১৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হক, পীর সাহেব, দুধমুখা, ফেনী।
১৭. মাওলানা মুহাম্মদ মাযহারুল হক, সাবেক মুহতামিম, উজানী মাদরাসা, কুমিল্লা।
১৮. মাওলানা কারী মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ্, পেশ ইমাম, চকবাজার জামে মসজিদ, ঢাকা।
১৯. মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।
২০. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা।
২১. মাওলানা মুহাম্মদ আতাউর রহমান খান, শাইখুল হাদীস, জামেয়া ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।
২২. মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী, ঢাকা।
২৩. মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম হক্কানী, পীর সাহেব, আড়াইবাড়ি, কুমিল্লা।
২৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের, মুফাসসিরে কুরআন, খুলনা।
২৫. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, প্রিন্সিপাল, নেছারিয়া আলিয়া মাদরাসা, খুলনা।
২৬. মাওলানা আলহাজ্জ মোহাম্মদ আকীল, জমিয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা।
২৭. মাওলানা মুহাম্মদ আজীজুল্লাহ, প্রিন্সিপাল, ইসলামিয়া মাদরাসা, নোয়াখালী।
২৮. মাওলানা আবদুস সাত্তার, খতীব, কাপ্তান বাজার মসজিদ, ঢাকা।
২৯. বিচারপতি মোঃ বাকের, ঢাকা।
৩০. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩১. মাওলানা সৈয়দ মুহম্মদ আলী, পরিচালক, দারুল আরাবিয়া, ঢাকা।
৩২. খন্দকার আবদুল হামীদ, কলামিস্ট ও সাবেক মন্ত্রী, ঢাকা।



www.icsbook.info

## সম্মেলনে যারা বক্তব্য রাখেন

দু'দিনব্যাপী সম্মেলনে মজলিসে সাদারাতের সকল সদস্যই বক্তব্য রাখেন। এছাড়া আরও যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন, তাদের তালিকা থেকেও ঐক্যমঞ্চের ব্যাপকতা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। তারা হলেন–

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ইমাম, আজীমপুর গোরস্থান মসজিদ।
২. অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক।
৩. মাওলানা আবদুল লতীফ, ফেনী।
৪. মাওলানা লুৎফুর রহমান, লক্ষ্মীপুর।
৫. মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, শাইখুল হাদীস, ঢাকা।
৬. অধ্যাপক মাওলানা মুনীরুয্যামান ফরিদী, ফরিদপুর।
৭. মাওলানা সরদার মুহাম্মদ আবদুস সালাম, বরিশাল।
৮. অধ্যাপক মাওলানা ইমদাদুল হক, গোপালগঞ্জ।
৯. মাওলানা আবদুল কাদের, মুফাসসিরে কুরআন, খুলনা।
১০. মাওলানা আবুল খায়ের যশোরী।
১১. মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী, সাংবাদিক।
১২. মাওলানা আবদুস সাত্তার ইসলামাবাদী, চট্টগ্রাম।
১৩. অধ্যাপক মাওলানা আবুল খায়ের।
১৪. মাওলানা আবদুল মালেক, মুহাদ্দিস, সিলেট।

## ইত্তেহাদুল উম্মাহর কর্মসূচি

ইত্তেহাদুল উম্মাহ যে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপক ঐক্যের ডাক দিয়েছে, তাতে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। ইনশাআল্লাহ, এ ঐক্য অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। সব মহলের ঐক্য স্থাপিত হলে ময়দানের দাবি অনুযায়ী ধাপে ধাপে বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর কর্মসূচি অবশ্যই প্রণীত হবে। প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে ইত্তেহাদুল উম্মাহ গঠনতন্ত্রে যে ৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, তার ভূমিকায় বলা হয়েছে, "এ কর্মসূচির আসল উদ্দেশ্য হলো, প্রচলিত ইসলামবিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল উৎপাটিত করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পুরোপুরি ইসলামী ছাঁচে রূপান্তরিত করা।"

এর চেয়ে বড় বিপ্লবী উদ্দেশ্য আর কী থাকতে পারে? কিন্তু এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে বিপ্লবী কর্মসূচি দরকার তা এখনই রচনা করা সম্ভব নয়। যাঁরা ইসলামী বিপ্লব চান তাঁরা সবাই এ প্লাটফর্মে সমবেত হলে আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে কর্মসূচিও বিস্তার লাভ করবে। 'বিপ্লবী কর্মসূচি নেই'— এ অজুহাত দেখিয়ে যারা এতে শরীক হবেন না, ইসলামী বিপ্লব তাদের নিকট চিরদিন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে।



www.icsbook.info

## প্রাথমিক পাঁচ দফা কর্মসূচি

'আল আমরু বিল মারূফ, ওয়ান-নাহী আনিল মুনকার'-এর যে মহান দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা ও রাসূলে করীম (স)-এর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর অর্পণ করা হয়েছে, সেই দীনী দায়িত্ব পালনই এ সংগঠনের কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আসল উদ্দেশ্য হলো, প্রচলিত ইসলামবিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পুরোপুরি ইসলামী ছাঁচে রূপান্তরিত করা। এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের প্রস্তুতিস্বরূপ এ সংগঠন ইসলাম ও মুসলিম জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নলিখিত পাঁচ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

১. ইসলাম সম্পর্কে যেসব বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ নেই সেসব বিষয়ের তালিকা প্রকাশ করবে। এতে প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (স)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজজীবন গঠন সম্পর্কে ইসলামী বিধানে বুনিয়াদী কোনো মতভেদ নেই। এর ফলে মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং জাহেলিয়াত ও বিদআতের শক্তি খর্ব হবে।

২. দেশের সরকার যা কিছু করেছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে সঠিক বক্তব্য পেশ করবে। ফলে সরকার ভুল করলে তা সংশোধনের সুযোগ পাবে। কোনো বিষয়ে ইসলামের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ রায় প্রকাশ করা হলে সরকার সহজে তা অমান্য করার সাহসই করবে না।

৩. যারা দেশ শাসন করেন এবং যারা শাসনক্ষমতায় আসতে চান তাদেরকে ইসলামের আদর্শ, মূল্যবোধ ও মূল্যমানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করবে, যাতে ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণে তারা তৌহিদী জনতার ভাবানুভূতির বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন।

৪. সকল দীনী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি এবং তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা চালাবে এবং কোথাও বিরোধ দেখা দিলে তাতে একটি মীমাংসায় পৌঁছতে সাহায্য করবে। ইখতিলাফযুক্ত বিষয়ে যাতে ই'তিদালের সীমা বজায় থাকে, সে উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে সহযোগিতা করবে এবং পারস্পরিক মুখালিফাতের ফলে জনগণের নিকট ইসলামের মর্যাদা যাতে নষ্ট না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখবে।

৫. কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে যে সমস্ত কার্যকলাপ মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও আমল-আখলাক বিনষ্ট করে, সেসব যাতে সমাজে চালু থাকতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।



www.icsbook.info

## ইত্তেহাদুল উম্মাহর মূলনীতি

অতীতের সকল অভিজ্ঞতার আলোকে ইত্তেহাদুল উম্মাহ ব্যাপক ভিত্তিক ইসলামী ঐক্যের মহান উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এমন কিছু সুচিন্তিত মূলনীতি প্রণয়ন করেছে, যাতে ঐক্যের পথে কোনো সমস্যা দেখা দিতে না পারে। সেসব মূলনীতি গ্রহণ করার ফলে কোনো মহল বা কোনো মাক্তাবে-খেয়ালের লোকের পক্ষেই 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ'তে শরীক হওয়ার পথে কোনো বাধা নেই। নিম্নে সে মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হলো :

### ১. ব্যাপক ঐক্য সম্পর্কে মূলনীতি

ক. মুসলমানদের কোনো দলকেই এই ইসলামী ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত করতে কোনোরূপ আপত্তি তোলা যাবে না। কেননা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত সবাইকে এরই মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

খ. যত রকম মতপার্থক্যই থাকুক, যারা ইসলাম থেকে খারিজ নয়, তাদের সবাইকেই এক পতাকাতলে সমবেত করতে হবে।

গ. যদি কোনো মহল ঐক্যে শামিল হওয়ার জন্য এই শর্ত পেশ করে যে, 'অমুক মহল, ফেরকা বা দলকে বাদ দিতে হবে' তাহলে এমন শর্ত কবুল করা হবে না। কারণ, এভাবে বাদ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করলে পূর্ণ ঐক্য কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না।

ঘ. শুধু ওলামা-মাশায়েখের ঐক্যই যথেষ্ট নয়; সকল শ্রেণী ও পেশার মুসলমানকেই ঐক্যে শরীক হওয়ার সুযোগ দিতে হবে, যাতে মুসলিম উম্মাহর সত্যিকার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঙ. হানাফী ও আহলে হাদীস, দেওবন্দী ও বেরেলভী, আলিয়া ও কাওমী ইত্যাদি নামে যত বিভেদই থাকুক, ইত্তেহাদুল উম্মায় সবাইকে সাদরে গ্রহণ করা হবে।

### ২. ইত্তেহাদুল উম্মাহর নেতৃত্বের ব্যাপারে মূলনীতি

ক. সকল মহলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মুসলিম উম্মাহ'র সামগ্রিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে।

খ. ইত্তেহাদুল উম্মাহতে সকল মহলের নেতৃবৃন্দের ঐক্যের ফলে যখন একটি সম্মিলিত নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে, তখন সর্বসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো এক ব্যক্তিকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া যাবে।

গ. সব সময়ই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন কোনো অবস্থায়ই নেতৃত্বের জন্য কোনো রকম প্রতিযোগিতা বা কোন্দলের পরিবেশ সৃষ্টি না হয়।



www.icsbook.info

### ৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে মূলনীতি

ক. যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতে হবে।

খ. কোন্ কোন্ বিষয়ে অধিকাংশের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে, সে সম্পর্কেও সর্বসম্মতভাবে ফায়সালা নিতে হবে।

গ. কোনো ইখতিলাফী বিষয়ে কোনো একটিমাত্র মতের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

### ৪. বিভিন্ন মত, পথ ও দলের মর্যাদা সম্পর্কে মূলনীতি

ক. ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্লাটফর্মে কোনো এক দলের প্রাধান্য থাকবে না। কেননা এখানে শরীক সবারই মর্যাদা সমান।

খ. প্রত্যেক দল ও মাসলাকের লোক নিজস্ব সংগঠনের কাজ আগের মতোই স্বাধীনভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন।

### ৫. রাজনৈতিক বিষয়ে মূলনীতি

ক. ইত্তেহাদুল উম্মাহ কোনো রাজনৈতিক সংগঠন না হলেও এতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি গ্রহণ করা যাবে।

খ. যেসব রাজনৈতিক দল ইসলামের স্বার্থে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ'তে শরীক হবেন, তাঁরা নিজস্ব দলীয় কর্মসূচি আগের মতোই চালিয়ে যেতে পারবেন।

গ. ইত্তেহাদুল উম্মাহ সরাসরি নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দাঁড় করাবে না। কিন্তু নির্বাচনের সময় ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে, সে উদ্দেশ্যে তাদের উপর সর্বপ্রকার নৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারবে।

উপরিউক্ত মূলনীতিসমূহ সুচিন্তিতভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে কোনো ইসলামী মহলই এ ঐক্যের বাইরে না থাকে এবং মতপার্থক্যের কারণেও এই ঐক্য বিনষ্ট না হয়।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর সাংগঠনিক কাঠামো এমন রাখা হয়েছে, যাতে এর মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার সুযোগ না থাকে এবং নেতৃত্ব নিয়ে কোনো রকম কোন্দলেরও সৃষ্টি না হয়। এ উদ্দেশ্যেই সংগঠনের কোনো একজনকে সভাপতি না করে বিভিন্ন মহলের প্রতিনিধিত্বকারীগণের সমন্বয়ে যৌথ সভাপতিত্বের ব্যবস্থা এতে রাখা হয়েছে।

### সম্মেলনের সাফল্যে পরম তৃপ্তিবোধ করলাম

এ সম্মেলনের মাধ্যমে আমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সফল হওয়ায় মহান মা'বুদের প্রতি শুকরিয়ায় প্রাণ ভরে গেল এবং মন-মগজও পরম তৃপ্তি লাভ করল। আমি সশরীরে সম্মেলনে হাজির না হলেও আমার অন্তর সেখানেই পড়েছিল। কাতরভাবে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়েছিলাম, যেন এই সম্মেলন পুরোপুরিভাবে সফল হয়।



www.icsbook.info

সম্মেলনের পরপরই মাওলানা সাঈদী সাহেব এসে আবেগের সাথে কোলাকুলি করলেন এবং সম্মেলন সম্পর্কে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, আপনি ঘরে বসে থেকেই ইত্তেহাদুল উম্মাহর মতো একটি ঐক্যমঞ্চ তৈরি করতে সক্ষম হলেন। আমি বললাম, আমি তো শুধু প্রস্তাবক ও পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করেছি। আপনারা ইখলাসের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন বলেই আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এ সাফল্য দান করেছেন। ঐক্যের ভিত্তি রচিত হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। এখন এ ঐক্যমঞ্চকে পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে অনেক মেহনত করতে হবে।

## মাওলানা সাঈদীর বিশেষ বিবরণ

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী আমার নিকট সম্মেলনের বিবরণ দিতে গিয়ে এমন একটা বিষয় জানালেন, যা শুনে পরম আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি বললেন, সম্মেলনে উপস্থিত ৩০০ ডেলিগেট সবাই যোগ্য ওয়ায়েয। তারা বক্তৃতায় শ্রোতাদের যেমন কাঁদাতে পারেন, তেমনি হাসাতেও পারেন। নিজেরা না কাঁদলেও তাদের অনেকের বক্তব্য শুনে জনগণ কাঁদে।

সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি, পটিয়া মাদরাসার সাবেক প্রখ্যাত শায়খুল হাদীস, পাকিস্তান আমলে খতীবে আযম উপাধিতে ভূষিত বয়োজ্যেষ্ঠ মাওলানা সিদ্দীক আহমদ এমন আবেগপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, যা সকলকে অভিভূত করে। তিনি নিজে তো কেঁদে কেঁদেই বক্তব্য রেখেছেন, সেই সাথে সবাইকেও কাঁদিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য সম্মেলনে গভীর দীনী আবেগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং সবার অন্তরে যেন ইসলামী জযবার বন্যা বয়ে যায়।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রকাশিত পুস্তক থেকে খতীবে আযমের বক্তৃতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করছি–

"হযরত মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি ও ভ্রাতা হযরত হারূন (আ)-এর নির্দেশ অমান্য করে বনী ইসরাঈলের একটি অংশ গো-বাছুর পূজার মতো শিরকী কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি উম্মতের ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে তাদেরকে উম্মত হতে বিচ্ছিন্ন না করে হযরত মূসা (আ)-এর আগমনের অপেক্ষা করেছেন এবং সাময়িকভাবে শিরককে বরদাশত করেছেন। কারণ, উম্মতের লোকদের সাময়িক কোনো বিভ্রান্তির সংশোধন যত সহজ, তিক্ততার মধ্যদিয়ে বিভক্ত হওয়ার পর স্বমতের প্রতি প্রাধান্য দানের স্বাভাবিক প্রবণতায় লিপ্ত বিভক্ত দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করা তত সহজ নয়।"

ইসলামের ভিত্তিতে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গঠনের স্বার্থে ছোটখাটো ইখতিলাফী বিষয় ভুলে যেতে সকল ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলাম-দরদি ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি আমি



www.icsbook.info

আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আসার সময় অনেকে নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু দু'দিনের সম্মেলন আমাকে যে কতটা অভিভূত করেছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এ বৃদ্ধ বয়সে কেউ আমাকে অর্ধঘণ্টা এক জায়গায় বসিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু এখানকার আলোচনা আমাকে এতই আকৃষ্ট করেছে যে, আমি সম্মেলন থেকে চলে যাওয়ার সময় দ্বিতীয়বার না আসার চিন্তা করলেও শেষ পর্যন্ত না এসে পারিনি। যেন আমি ইত্তেহাদুল উম্মাহর আকর্ষণে গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছি। ইত্তেহাদুল উম্মাহর এ সম্মেলনে শরীক হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

"আমি আজ জীবনসায়াহ্নে এসে উপনীত হয়েছি। আমার দেহের শক্তি প্রায় ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সম্মেলনে এসে আমার ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এই সম্মেলনের পর আপনাদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। আমি নোয়াখালী থেকে আমার সফর শুরু করব। সারা বাংলাদেশে ইত্তেহাদের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি আপনাদের কাছে এ দুআ চাচ্ছি, যেন আমার মৃত্যু মুসলিম উম্মাহর ইত্তেহাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই হয়।"

হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমদ অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "ইত্তেহাদুল উম্মাহর সম্মেলনে আমি এসেছিলাম সন্দিহান মন নিয়ে, কিন্তু ফিরে যাচ্ছি সংশয়মুক্ত এবং আশাবাদী অন্তর নিয়ে। এ সম্মেলনে আগত ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও ইসলামদরদি সুধী ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্যের নিষ্ঠাপূর্ণ সাড়া লক্ষ্য করে আমি গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছি। আমি বালেগ হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন মতের ওলামা ও মাশায়েখকে এভাবে একত্রিত হতে খুব কমই দেখেছি। আমি ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজনীতি করেছি; কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ব্যাপারে তেমন কিছু করতে পারিনি। আপনারা দুআ করবেন, যেন আল্লাহ আমাকে মাফ করেন। আমি আমরণ ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্যের উদ্দেশ্যে নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি হিসেবে আমার সকল সদস্য ও সাথীকে নিয়ে ইত্তেহাদুল উম্মাহর পক্ষে কাজ করে যাব।"

## ইত্তেহাদুল উম্মাহর অগ্রগতি

ইসলামী জনতা ইসলামী নেতৃবৃন্দের ঐক্যের জন্য পাগল। কিন্তু যে নেতাগণ একমঞ্চে সমবেত হলেই ঐক্য হয়, তাদের কারণেই এ ঐক্য হচ্ছে না। কোনো একজনকে অন্যরা নেতা মেনে নিতে রাজি হন না বলেই তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। ইত্তেহাদুল উম্মাহ এ সমস্যার সমাধান করায় এখন ঐক্য সৃষ্টির প্রধান বাধাটি দূর হয়ে গেল। তাই সারা দেশে ঐক্যের পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেল।



www.icsbook.info

ইত্তেহাদুল উম্মাহর পক্ষ থেকে কোনো সময় পত্রপত্রিকায় কোনো বক্তব্য রাখার প্রয়োজন হতে পারে। তাই এক বছরের জন্য ইত্তেহাদুল উম্মাহর মুখপাত্রের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় চরমোনাইর পীর সাহেবের উপর।

ইত্তেহাদুল উম্মাহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে সম্মেলন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করে জনগণ থেকে বিপুল সহযোগিতা পেয়েছে। মাওলানা মাসুম, চরমোনাইর পীর সাহেব, মাওলানা সাঈদীসহ কেন্দ্রীয় মজলিসে সাদারাতের পাঁচ-ছয় জন সদস্য যেখানেই সম্মেলনে হাজির হবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেখানেই স্থানীয় ইসলামপন্থি সকল মানুষ অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত হয়েছে। সম্মেলনের এন্তেজামিয়া কমিটিতে সর্বস্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ শরীক ছিলেন।

সম্মেলনের ব্যয়ভার বহনের জন্য এন্তেজামিয়া কমিটিকে তহবিল সংগ্রহে সামান্যও বেগ পেতে হয়নি। অনেকে নিজে এসেই অর্থ-সাহায্য দিয়ে গেছেন। সম্মেলনে এত লোকসমাগম হয়েছে যে, তাতে উদ্যোক্তা, বক্তা ও শ্রোতা সবাই অত্যন্ত উৎসাহবোধ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয়, ইসলামী নেতৃবৃন্দকে একমঞ্চে দেখার জন্য ইসলামী জনতার কামনা কত তীব্র এবং তাদের আবেগ কত গভীর। ঐসব সম্মেলনে মাওলানা সাঈদী সাহেবের সফরসঙ্গী মাওলানা মীম ফযলুর রহমান বলেন, প্রতিটি সম্মেলনশেষে তহবিলের বেশ কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ ইত্তেহাদুল উম্মাহর কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হয়।

জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে ইত্তেহাদুল উম্মাহর যে সম্মেলন হয়, তাতে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফযলুল করীম একসাথেই শরীক হন। ইত্তেহাদুল উম্মাহর সেক্রেটারি হিসেবে বরিশাল জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মাওলানা ফযলুর রহমান সংগঠকের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি মাওলানা সাঈদী সাহেবের সেক্রেটারি হিসেবেও সর্বত্র তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। তিনি ঐসব সম্মেলনের সাফল্য, জনগণের বিপুল সাড়া এবং মাওলানা সাঈদীর অদ্ভুত জনপ্রিয়তার বিবরণ আমাকে নিয়মিত শোনাতেন। আমিও তাতে অত্যন্ত উৎসাহবোধ করতাম।

মাওলানা সাঈদীও ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাধ্যমে সকল ইসলামী মহলের ঐক্যের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে আমার নিকট অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করতেন। একাধিক বার তিনি আমার সামনে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছেন, "আপনি এমন এক চমৎকার ফর্মুলা দিয়েছেন– যার ফলে এ সংগঠনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব নয়; বরং সামষ্টিক নেতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। আর অরাজনৈতিক সংগঠন হওয়ায় এতে দলাদলির কোনো আশঙ্কাও দেখা যাচ্ছে না।"



www.icsbook.info

একবার তিনি আবেগের সাথে মহব্বতপূর্ণ সুরে বললেন, "আপনার তো ময়দানে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে না। এমন সুন্দর পরিকল্পনা দিলেন, যা ময়দানে ক্রিয়াশীল রয়েছে। আপনি ঘরে বসে থেকে বিভিন্ন মহলকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হলেন। আলহামদুলিল্লাহ!

## ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন

১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে টিএন্ডটি কলোনী মসজিদে ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। '৮১ সালে প্রতিষ্ঠার পর এক বছরে জেলা শহরগুলোতে সম্মেলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পেয়ে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পায়। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলনে তাঁরা দু'জন ব্যক্তিত্বকে হাজির করার চেষ্টা করেন। একজন হাফেযজী হুজুর, অপর জন ছারছীনার পীর সাহেব মাওলানা আবূ জাফর মুহাম্মদ সালেহ। পীর সাহেবকে তারা নাগাল পেয়েছিলেন কিনা আমি জানতে পারিনি। তবে হাফেযজী হুজুর ঢাকায় অবস্থান করেন বলে আমি এ বিষয়ে অবহিত হই।

সম্মেলনের আগের দিন চরমোনাইর পীর সাহেবের উদ্যোগে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত হাফেযজী হুজুরকে সম্মেলনে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে যান। পীর সাহেব ইত্তেহাদুল উম্মাহর মুখপাত্রের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি যাদেরকে সাথে নিয়ে যান তারা হলেন–

১. মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম।

২. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

৩. ক্যাপ্টেন আবদুর রব, অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় সহকারী কমিশনার। তিনি দারুণ আবেগ নিয়ে ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে ইত্তেহাদুল উম্মাহতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রাজশাহী বিভাগে চাকরিরত অবস্থায় বিভিন্ন ইসলামী মাহফিলে তাঁকে আমি অত্যন্ত জোশীলা ভাষায় বক্তৃতা দিতে দেখেছি।

ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হাফেযজী হুজুরের দরবারে পৌঁছার পর চরমোনাইর পীর সাহেব কথা শুরু করতেই তিনি উত্তেজিত হয়ে ধমকের সুরে বলেন, "তুমি কেমন করে জামায়াতের ধোঁকায় পড়লে? নতুন শাড়ি পরে নতুন নাম নিয়ে এটা তো মওদূদী-জামায়াতই।" শেষ পর্যন্ত তাঁরা এক রকম বিতাড়িত হয়েই সেখান থেকে ফিরে আসেন।

অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন ডেলিগেটগণ ছাড়াও অনেক নতুন লোক এতে শরীক হন। এ সম্মেলনে ঐক্যের দাওয়াত সারা দেশে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী বছরের জন্যও চরমোনাইর পীর সাহেবকে ইত্তেহাদুল উম্মাহর মুখপাত্র নির্বাচিত করা হয়।



www.icsbook.info

## হাফেযজী হুজুরের সাথে আমার সাক্ষাতের চেষ্টা

চরমোনাই'র পীর সাহেব লালবাগ মাদরাসারই ছাত্র। হাফেযজী হুজুর পীর সাহেবের উস্তাদের উস্তাদ। ইসলামী ঐক্য আন্দোলনে হাফেযজী হুজুরকে শরীক রাখার প্রচেষ্টা তিনি জারি রাখলেন। একদিন পীর সাহেব আমার বাড়িতে হঠাৎ করে বিনা খবরেই এলেন। তিনি মেহেরবানী করে বহুবারই আমার বাড়িতে এসেছেন এবং কোনো সময়ই যোগাযোগ করে আসেননি। ঐদিন এসে বললেন, হাফেযজী হুজুরের সাথে আপনাকে সাক্ষাৎ করতে হবে। আমি তাঁকে ঐক্যের ব্যাপারে বোঝাতে পারলাম না। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনারা যদি তাঁকে বোঝাতে সক্ষম না হয়ে থাকেন, তাহলে আমার পক্ষে তা কেমন করে সম্ভব হবে? তিনি বললেন, আমি আপনাদের দু'জনকে একত্রে বসাতে চাই। বললাম, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আপনি দিন-তারিখ ঠিক করে আমাকে জানান। আপনি নিজে এসে যদি আমাকে সাথে করে নিয়ে যান তাহলে আমি অবশ্যই যাব।

১৯৮৩ সালের ঘটনা। পীর সাহেব দিন-তারিখ-সময় নির্দিষ্ট করে আমাকে জানালেন। ঐ ধার্যকৃত তারিখে আমি যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে রইলাম। সকাল ৯টায় পীর সাহেব আমার বাড়িতে পৌঁছার কথা। কেননা, ১০টায় সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারিত। সকাল সাড়ে আটটায় পীর সাহেব আমাকে ফোন করলেন। অত্যন্ত আফসোস করে বললেন, হঠাৎ গত রাতে হাফেযজী হুজুর তেহরান চলে গেছেন বলে সাক্ষাৎ হচ্ছে না। এভাবেই পীর সাহেবের ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

## হাফেযজী হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ

১৯৮৪ সালে আমার এক দীনী বন্ধু মাওলানা আবদুল হাই আমাকে না জানিয়েই হাফেযজী হুজুরের সাথে আমার সাক্ষাতের জন্য চেষ্টা চালালেন। হুজুরের ছেলেরা তার খালাত ভাই। তিনি বয়সে তাদের বড়। তাদের সামষ্টিক চেষ্টায় হাফেযজী হুজুর আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হলেন। মাওলানা আবদুল হাই মোহাম্মদপুরে থাকতেন। এখনও সেখানেই থাকেন। তাঁর বর্তমান বয়স ৭৮ বছর।

আমি ফোনে ইত্তেহাদুল উম্মাহর অফিস সেক্রেটারি মাওলানা মাযহারুল হককে জানালাম, হাফেযজী হুজুরের সাথে আমার অমুক সময় সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে। চরমোনাই'র পীর সাহেব ঢাকায় আছেন কি না, খোঁজ নিন। তিনিই তো এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। যদি তাঁকে পাওয়া যায় তাহলে যথাসময়ে ওখানে হাজির থাকার জন্য আমার পক্ষ থেকে অনুরোধ করবেন। মাওলানা আমাকে ফোনে জানালেন, পীর সাহেব যথাসময়ে যাবেন। আমি খুব খুশি হলাম। কারণ, তিনি হাজির থাকলে ইসলামী ঐক্যের পক্ষেই কথা বলবেন।



www.icsbook.info

১৯৮৪ সালের এপ্রিলের কোনো এক তারিখে মাওলানা আবদুল হাই আমাকে হাফেযজী হুজুরের দরবারে নিয়ে গেলেন। আমার সাথে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীও যান। সেখানে হাফেযজী হুজুরের তিন ছেলে এবং ১০/১২ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন চরমোনাই'র পীর সাহেব।

হাফেযজী হুজুর চৌকিতে বসা ছিলেন। বাকি সবাই মেঝেতে। আমাদের দু'জনকে চৌকিতেই হাফেযজী হুজুরের সামনে বসতে দেওয়া হলো।

আমি তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছি। কেন গেলাম সে কথা তো প্রথমে আমাকেই বলতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার বক্তব্য পেশ করলাম, যার সারকথা হলো–

"ইসলামের বিজয়ের পথে ইসলামী ঐক্যের অভাবই প্রধান বাধা। আপনি ইসলামী খিলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে এ বয়সে নির্বাচন করলেন এবং 'খেলাফত আন্দোলন' নামে একটি ইসলামী সংগঠনও কায়েম করলেন। সবার মুরব্বী হিসেবে সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপনি ডাক দিতে পারেন। আপনার ডাকে জামায়াতে ইসলামীও সাড়া দিতে প্রস্তুত রয়েছে।"

তিনি কথা শুরু করলেন। আওয়াজ খুবই অস্পষ্ট মনে হলো, তাঁর কথা শোনার প্রয়োজনে চৌকিতে এগুতে এগুতে তাঁর এতটা কাছে যেতে বাধ্য হলাম যে, আমার কান তাঁর মুখের মাত্র এক ফুট দূরে ছিল। তাঁর বক্তব্যের সারকথা নিম্নরূপ :

"আমাদের আকাবিরীন (নেতৃস্থানীয় আলেমগণ) মাওলানা মওদূদীর খিলাফত সম্পর্কিত চিন্তাধারাকে সহীহ মনে করেন না। মাওলানা থানভী (র) (যিনি তাঁর পীর এবং তিনি যার খলীফা) মাওলানার চিন্তাধারা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, আমার দিলে এতমিনান (আস্থাবোধ) হয় না"। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উর্দুতেই কথা বললেন।

আমি বললাম, "মাওলানা মওদূদীকে আমরা নির্ভুল মনে করি না। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁর লিখিত কিতাবাদিতে কী কী ভুল আছে, তা ধরিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই তা মেনে নেব। আপনি কয়েকজন আলেমকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দিলে জামায়াতের কয়েকজন তাদের সাথে বসে ভুলগুলো জেনে নিতে পারবেন। আর এ জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।"

চরমোনাই'র পীর সাহেব বললেন, হুজুর অনুমতি দিলে আমরা এ ব্যবস্থা করতে পারি। হাফেযজী হুজুরের মেঝো ছেলে হাফেয হামীদুল্লাহ অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন, "আব্বা! আপনি এজাযত দিন— এ ঝগড়ার মিটমাট হয়ে যাক।"



www.icsbook.info

হাফেযজী হুজুর রাগতকণ্ঠে হাত উঁচিয়ে বললেন, "আমি তোমাদের সাথে নেই; আমি বুযুর্গানে দীনের সাথে আছি।" উত্তেজিত অবস্থায় বলায় এ কথাটি স্পষ্ট বোঝা গেল। উপস্থিত সবাই একদম হতবাক হয়ে রইলেন। আমরা দু'জন সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে এলাম।

হাফেযজী হুজুরের সাথে এ বৈঠকের উদ্যোক্তা মাওলানা আবদুল হাইকে আজ (১৯.০৬.'০৫) এ লেখাটা পড়ে শোনালাম। তিনি বললেন, "বৈঠকে হাফেযজী হুজুরের দু'জামাতাও উপস্থিত ছিলেন।"

মাওলানা আবদুল হাই আরও বললেন, "আপনাদের সাথে সাক্ষাতের পরের দিন আমি আবার হাফেযজী হুজুরের নিকট গিয়ে বলেছিলাম, হুজুর! এমন একটা সুন্দর প্রস্তাব আপনি কেন গ্রহণ করলেন না? জামায়াতের সাথে বসে তাদেরকে সংশোধন করার সুযোগটা নিলে কি ভালো হতো না?"

জবাবে হাফেযজী হুজুর নাকি বলেছিলেন, "ওদের সাথে বসায় অসুবিধা আছে। ওরা জানে, আরবের আলেমগণ মাওলানা মওদূদীকে সমর্থন করবে। আমরা আপত্তি তুললে তারা আরবের আলেমদের অভিমতও তুলে ধরতে পারে।" তখন মাওলানা আবদুল হাই নাকি বলেছিলেন, আরবের আলেমদের কি ইসলাম সম্পর্কে সহীহ্ ইল্‌ম নেই? হাফেযজী হুজুর এ কথার কোনো জবাব দেননি।

## আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে গেল

১৯৮৬ সালের শেষদিকে এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে ১৯৮৭ সালে ইত্তেহাদুল উম্মাহ হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি আমার জীবনে অন্য কোনো দুর্ঘটনায় এত গভীর ও স্থায়ী মর্মবেদনা অনুভব করিনি। ইসলামী ঐক্যের দীর্ঘকালের স্বপ্ন 'ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভের প্রবল আশা নিয়ে যখন আমি পরম উৎসাহবোধ করছিলাম তখনই এমন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, যা আমার কাছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত বলে মনে হয়েছে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য যেখানে আশা করেছিলাম, সেখানেই আমি আমার জীবনের সবচাইতে বড় ব্যর্থতার সম্মুখীন হলাম।

যারা আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তারা আমার জীবনের বড় সাফল্য ও বড় ব্যর্থতার কথা জিজ্ঞেস করলে আমি চরম মর্মবেদনা নিয়ে এ ব্যর্থতার কথাই অকপটে প্রকাশ করি।

দেশ-বিদেশে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'ইত্তেহাদুল উম্মাহর কী হলো? এর সুনাম যারা শুনেছে তাদের জানার অধিকার আছে যে, ইত্তেহাদুল উম্মাহ কীভাবে মরে গেল?



www.icsbook.info

আমার মনের জ্বালা লাঘব করার জন্য এ বিষয়ে লেখা প্রয়োজন মনে করছি। যারা আমাকে প্রশ্ন করেছেন এবং যাদের মনে এ প্রশ্ন রয়েছে তারা এ থেকে জানতে পারবেন যে, কিছু লোকের ভুলের কারণে এত বড় ক্ষতিটা হয়ে গেল। অবশ্য তারা এ সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যেই ঐ কাজ করেছেন বলে আমি মনে করি না।

যত নেক নিয়তেই কেউ কোনো ভুল করুক, ভুলের মাশুল তাকে দিতেই হয়। ভুল কাউকেই ক্ষমা করে না। ভুলের পরিণাম যা হওয়ার তা-ই হয়। কেউ তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। এরপরও ইসলামী ঐক্যের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু ঐ ফর্মুলা চালু না থাকায় নেতৃত্বের খাহেশ যাদের আছে তাদেরকে সাথে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সামষ্টিক নেতৃত্বের পদ্ধতি পুনরায় চালু করতে পারলে এ সম্ভাবনা আবার দেখা দিতে পারে।

## ইত্তেহাদুল উম্মাহ কীভাবে ভেঙ্গে যাওয়ার সূচনা হলো?

দীনের ভিত্তিতে সকল ইসলামী মহলকে একমঞ্চে সমবেত করার পরিকল্পনা নিয়েই ইত্তেহাদুল উম্মাহ কায়েম করা হয়। ঐক্য পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর মজলিসে সাদারাত (সভাপতিমণ্ডলী) যখন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা সমীচীন মনে করবে তখন দেশের পরিস্থিতি, জনগণের সাড়া ও সাফল্যের সম্ভাবনা বিবেচনা করে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। সকল মহলকে ঐক্যবদ্ধ করার পূর্বে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে ঐক্যের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এ কারণেই ইত্তেহাদুল উম্মাহর গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয় যে, এ সংগঠনটি একটি অরাজনৈতিক সংস্থা।

দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে ইত্তেহাদুল উম্মাহর মজলিসে সাদারাতের এক বৈঠকে প্রস্তাব উত্থাপিত হলো যে, বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের দাবিতে আন্দোলন করা জরুরি। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ইত্তেহাদুল উম্মাহকে অরাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে মজলিস সাদারাতের অন্তর্ভুক্ত জামায়াতে ইসলামীর যে দু'জন সদস্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন তাঁরা হলেন মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী। ঘটনাক্রমে মজলিসে সাদারাতের ঐ বৈঠকে এ দু'জনই অনুপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত অন্য কেউ খেয়াল করলেন না যে, ঐ প্রস্তাব গঠনতন্ত্রের বিরোধী। ইত্তেহাদুল উম্মাহর জেলা সম্মেলনগুলোতে জনগণের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার ফলে সবার মধ্যেই প্রবল জোশ বিদ্যমান ছিল। ফলে ঐ প্রস্তাব সেখানে পাস হয়ে গেল। এমনকি জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়ার তারিখও নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এমনকি সেদিন প্রেস কনফারেন্সে কে কে বক্তব্য রাখবেন, সে সিদ্ধান্তও হয়ে গেল।



www.icsbook.info

## মাওলানা সাঈদী সাহেবকে আন্দোলনের নেতা বানানোর পরিকল্পনা

বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র দাবির আন্দোলনে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণের পরিকল্পনা যারা করেছিলেন তারা জামায়াতে ইসলামী বলয়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলামকে আধুনিক শিক্ষিতদের নিকট যোগ্যতার সাথে পরিবেশন করতে সক্ষম হওয়ায় তাঁদের সাথে আমার মহব্বতের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরাও আমাকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করেন। মহব্বত তো একতরফা হয় না। তাঁরা আলেম হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদীর রচিত তাফসীর ও বিশাল ইসলামী সাহিত্যভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করার ফলে যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তা বিভিন্নভাবে দেশবাসীর নিকট পরিবেশন করছেন।

মাওলানা সাঈদী ওয়ায়েয ও মুফাস্সিরে কুরআন হিসেবে বাংলাদেশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নিকট যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তার ফলে ইসলামী শাসনতন্ত্র দাবির আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁকে বাছাই করা ছিল স্বাভাবিক। মজলিসে সাদ্যরাতের সদস্যরা জানতেন যে, জামায়াতে ইসলামীর রুকন হিসেবে সংগঠনের প্রতি মাওলানা সাঈদীর নিরঙ্কুশ আনুগত্য রয়েছে। তাই তাঁরা মাওলানা সাঈদীকে নেতৃত্বগ্রহণে সম্মত করার জন্য একটি চমৎকার যুক্তি তাঁর সামনে পেশ করেন। যুক্তিটি নিম্নরূপ :

“দেশের জনগণ ইসলাম চায়। আপনার মহফিলে যেকোনো সময় দলে দলে নারী-পুরুষ পরম আবেগ নিয়ে হাজির হয়। তারা মাহফিলে ‘আল কুরআনের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো’ স্লোগান শিখে এবং বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় এ স্লোগানটি দিতে দিতেই যায়। কুরআনের শাসন কায়েমের দাবিতে তাদেরকে আপনি ডাক দিলে তারা জান দিতেও পরওয়া করবে না। ফলে কোটি কোটি তৌহিদী জনতা পাগলপারা হয়ে এ আন্দোলনে শরীক হবে এবং এ আন্দোলনের ফসল জামায়াতে ইসলামীর ঘরেই উঠবে। জনগণের ময়দানে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জনশক্তি যেহেতু জামায়াতই তৈরি করেছে, তাই এর ফসল অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর সম্মেলনগুলোতে জনগণের মধ্যে যে সাড়া দেখা যাচ্ছে, তাতে এ আন্দোলনের জন্য ময়দান সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে স্পষ্ট বোঝা যায়। গাছে ফল পেকে আছে। ঝাঁকি দিলেই পড়বে। তাই এ আন্দোলন আর বিলম্বিত করা চলে না।

## তাদের ইজতিহাদী ভুল

এ পরামর্শদাতাগণ যে ইজতিহাদী ভুল করেছেন, তা তাঁরা টের পাননি। যে জামায়াত এ আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলবে বলে তারা নিশ্চিত হলেন সে জামায়াত এ ফসল গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি না, তারা ফল পেকে গেছে মনে করে কি না বা এ আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত কি না, তা জানার কোনো প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করলেন না। এত বড় ভুল তাঁরা কেমন করে করলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।



www.icsbook.info

### তাঁদের নিয়ত সম্পর্কে আমি সন্দেহ করি না

এ আন্দোলনে মাওলানা সাঈদীকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁদের কোনো কুমতলব ছিল বলে আমি মনে করি না। তাঁরা হয়ত আন্তরিকতার সাথেই এ পথে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কে কে বা কতজন এর সাথে জড়িত ছিলেন, তা আমার জানা নেই। তাঁদের যে ক'জনের নাম আমার কানে এসেছিল এর মধ্যে একজন মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দীন জাফরী। তাঁর সাথে আমার বহু বছর থেকে মহব্বতের সম্পর্ক। তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই এ সম্পর্ক শুরু হয় বলে তিনি আমার সাথে এমন আচরণ করেন, যেন তিনি আমার ছাত্র এবং আমি তাঁর উস্তাদ, যদিও সম্পর্ক এ ধরনের নয়।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত নরসিংদীর প্রখ্যাত জামেয়া কাসেমিয়ায় তিনি আমাকে বহু বার যেতে বাধ্য করেছেন। তিনি দাবি করলে আমি যেতে আপত্তি করতে পারি না বলেই বাধ্য হয়ে গিয়েছি। গত বছর (২০০৪ সালে) তিনি নিজের গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পথে আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঐ বিষয়ে জানতে চাইলাম যে, 'এ রকম যে কথা শুনেছিলাম; তা কতটুকু সত্য?' তিনি অত্যন্ত খোলামনে উৎসাহের সাথে তাঁর ঐ সময়কার প্রচেষ্টার কথা আমাকে বিস্তারিত জানালেন।

যদি এ ব্যাপারে তাঁর নিয়তে সামান্য ত্রুটিও থাকত, তাহলে কি তিনি এভাবে প্রাণখুলে কথাটি বলতে পারতেন? তাহলে হয়ত পাশ কাটানোর চেষ্টা করতেন বা এমন সরলভাবে স্বীকার না করে কৌশল করে অস্বীকার করতে পারতেন। এমন মুখলিস মানুষের নিয়তে কি সন্দেহ করা সম্ভব?

### বিষয়টা আমরা বিলম্বে জানতে পেরেছি

এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ইত্তেহাদুল উম্মাহর মজলিসে সাদারাতের বৈঠকে গৃহীত ঐ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা ১৯৮৭ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে জানতে পেরেছি। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে যখন সিদ্ধান্ত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলে আবার একটা বৈঠক ডেকে ঐ রাজনৈতিক কর্মসূচিকে গঠনতন্ত্রবিরোধী হওয়ার কারণে প্রত্যাহার করা হয়তো সম্ভব হতো।

আধুনিক প্রকাশনীর তৎকালীন সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য জনাব আবদুল গাফফারের শ্বশুর মাওলানা খন্দকার আবুল খায়ের যশোরীর নিকট থেকে জানা গেল, ইরানি দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনের কর্মসূচি তৈরির ঐ বৈঠকে যশোরী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা যশোরী জামায়াতের অনেক পুরনো রুকন এবং বহু বছর জামায়াতে ইসলামী যশোর জেলার আমীর ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক বহু পুস্তক তিনি রচনা করেছেন।



www.icsbook.info

ইরানি দূতাবাসের কেউ এতে জড়িত হয়ে থাকলে আমি তাদেরকে দোষী মনে করব না। তারা হাফেযজী হুযুরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন ইসলামের স্বার্থেই। তারা যদি বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনে সহযোগিতা করে থাকেন তাহলে ইসলামের জন্যই তা করেছেন।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন হওয়া সত্ত্বেও ৩১ জানুয়ারি শূরার এক জরুরি অধিবেশন ডাকা হয়। আমাদের আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট গোটা জনশক্তি মাওলানা সাঈদীকে মহব্বত করেন। তাই মজলিসে শূরাকে এ সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, যাতে জনশক্তিকে ডিল করতে সমস্যা না হয়। মজলিসে শূরাকে বলা হলো, মাওলানা সাঈদী সফরে আছেন। তিনি ফিরে এলেই তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হবে। সংগঠনের প্রতি তাঁর আনুগত্যের যে প্রমাণ এ পর্যন্ত তিনি দিয়েছেন, তাতে তাঁর প্রতি জামায়াতের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি যখনই জানতে পারবেন যে, জামায়াত ও শিবির ঐ নতুন আন্দোলনে শামিল হবে না, তখনই তিনি বিরত হয়ে যাবেন। যারা তাঁকে এ পথে এতদূর টেনে নিয়ে গেছেন তাদেরকে ত্যাগ করে ফিরে আসতে তিনি এতটুকুও দ্বিধাবোধ করবেন না বলে আশা করা যায়।

তবুও খোদা না করুন, যদি এ আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং তিনি তাতে শরীক থাকেন তাহলে আমাদের জনশক্তি যেন নীরবে তাতে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকে। এর চেয়ে বেশি কোনো প্রতিক্রিয়া যেন কেউ না দেখায়। সবাইকে এতটুকু অবহিত করেই শূরার জরুরি অধিবেশন সমাপ্ত করা হয়।

## ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রেস কনফারেন্স

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের যেদিন 'আগামীকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে' বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলো সেদিন মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে একান্তে কথা বললেন। মাওলানা ইউসুফ মাদরাসায় মাওলানা সাঈদীর শিক্ষক। তদুপরি তিনি তখন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল। এ কারণেই জামায়াতের পক্ষ থেকে মাওলানা সাঈদীর সাথে আলোচনা করার দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পণ করা হয়েছিল।

উভয়ের মধ্যে যে আন্তরিক মহব্বতের সম্পর্ক রয়েছে সে পটভূমিতে মাওলানা ইউসুফ কোনো কৈফিয়ত তলব না করে শুধু এটুকু কথা জানিয়ে দিলেন, "আগামীকাল প্রেস কনফারেন্স করে যে আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়ার কথা রয়েছে, তাতে আপনি যদি শরীক হন তাহলে তা আপনার নিজস্ব ফায়সালা। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে এ আন্দোলনে আপনার সাথে পাবেন না। কারণ,



www.icsbook.info

জামায়াত এ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। আপনি আজীবন জামায়াত ও শিবিরের সাথে ইসলামী আন্দোলন করে এসেছেন, এখন জামায়াত ও শিবিরকে বাদ দিয়ে এ আন্দোলনে যাবেন কি না চিন্তা করে দেখুন।"

এ সিদ্ধান্ত জানার পর মাওলানা সাঈদীর এক মিনিটও বিলম্ব হলো না। তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলে উঠলেন, "জামায়াত ও শিবিরকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।"

আমরা তাঁর কাছ থেকে এটাই আশা করেছিলাম। সংগঠনের প্রতি তাঁর আনুগত্য নিরঙ্কুশ বলেই আমরা জানতাম। তিনি জামায়াত ও শিবিরকে ছেড়ে গেলে যে এ ময়দানে কিছুই করতে পারতেন না, এমনও নয়। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে একটা আন্দোলন অবশ্যই তিনি খাড়া করতে পারতেন। কিন্তু এ আন্দোলনের ফসল জামায়াতের ঘরে উঠবে বলে যে ধারণা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তা যে হবে না–এ কথা বুঝতে তাঁর এক মুহূর্তও বিলম্ব হয়নি।

সারা দেশে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যে বিশাল জনপ্রিয়তা দিয়েছেন তাতে তিনি যে-কোনো সময় ইচ্ছা করলে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন। তিনি জামায়াতের পুরানা রুক্‌ন হিসেবে খুব ভালো করেই জানেন যে, জামায়াত যে পদ্ধতিতে সংগঠন পরিচালনা করে এবং যে কঠোর নিয়ম মেনে চলে এমন সংগঠন করা খুবই কঠিন কাজ। তাই তিনি সংগঠনের আনুগত্যে কোনো সময়ই দুর্বলতা দেখাননি।

## পরের দিনের কাহিনী

পরের দিন জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা। মাওলানা সাঈদী সেখানে যাবেন না বলে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। সেখানে কী ঘটবে সে বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য অবশ্যই ছিল।

সেদিন বেলা ১০টায় হঠাৎ বেগম সাঈদী আমার বাড়িতে এসে হাজির। আমি রীতিমতো অপ্রস্তুত। তিনি পেরেশান হয়ে বলতে লাগলেন, "একদল লোক মাওলানা সাঈদীকে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য একটি আন্দোলনের নেতৃত্বে তাঁকে অধিষ্ঠিত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। গত মধ্যরাত পর্যন্ত তারা আমাদের বাড়িতে তাঁর পা ধরে ধরনা দিয়েছে। আপনি তাঁকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচান।"

আমি ধীরকণ্ঠে বললাম, "ভাবী! আপনি পেরেশান হবেন না। তিনি ওদের সাথে যাবেন না বলে গতকালই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।" আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম যে, বেগম সাঈদী এতটা রাজনীতি-সচেতন কেমন করে হলেন? তিনি তো সংগঠনেও তেমন কোনো দায়িত্বে নেই। অথচ এ সময় মাওলানা সাহেবকে কতক লোক জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করছে বলে কেমন করে বুঝতে পারলেন? আমি তাঁর বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হলাম।



www.icsbook.info

বিকেলে বিনা খবরে অত্যন্ত সম্মানিত ও আমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত দুজন ব্যক্তি আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তাঁরা হলেন চট্টগ্রামের বাইতুশ শরফের পীর সাহেব মাওলানা আবদুল জাব্বার ও চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদের খতীব মাওলানা আবদুল আহাদ আল-মাদানী। আমি তাঁদেরকে সসম্মানে গ্রহণ করে বললাম, হঠাৎ বিনা খবরে তশরীফ আনলেন, ব্যাপার কী? মাওলানা মাদানী বললেন, "মাওলানা সাঈদীকে আপনারা কোন্‌খানে লুকিয়ে রেখেছেন? বললাম, তিনি কোথায় আছেন আমার জানা নেই। তাঁরা বললেন, "তাঁকে বের করে আনেন। আমরা প্রেসক্লাবে গেলাম। অথচ তিনিই সেখানে গেলেন না।" তিনি কোথায় আছেন জানি না বলে আমি তাঁদেরকে নাস্তা করিয়ে বিদায় দিলাম। তিনি কোথায় তা তো আমার জানা থাকার কথাও নয়।

আজ (১৫ জুন ২০০৫) মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের সাথে আলোচনা করে আরও কতক তথ্য পেলাম, যা আমার জানা ছিল না। আমি বেগম সাঈদীকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলাম, মধ্যরাত পর্যন্ত যারা মাওলানা সাহেবের নিকট ধরনা দিলেন তাদের নাম তিনি বলতে পারেন কি না। এ ফোনের কথা জানতে পেরেই মাওলানা সাঈদী আরও কিছু তথ্য দিয়ে গেলেন।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ঢাকার শাহজাহানপুর রেলওয়ে ময়দানে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী তাফসীর মাহফিলে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। কাছেই কোথাও বামপন্থিদের সভা হচ্ছিল। ওখানকার মসজিদে যখন নামাযের জামাআত হয় তখন তাদের মাইকের আওয়াজে নামাযীদের অসুবিধা হওয়ায় কতক মুসল্লী তাদেরকে কিছুক্ষণ মাইক বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু তারা আরও জোরে মাইক চালু রাখে। এতে মুসল্লীরা পুনরায় আপত্তি জানালে ওরা মসজিদে হামলা চালানোর ধৃষ্টতা দেখায়।

মাওলানা সাঈদী এর প্রতিবাদে তাফসীর মাহফিলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তব্য রাখেন এবং পরের দিন বাইতুল মুকাররাম থেকে প্রতিবাদ মিছিলের ঘোষণা দেন। নির্দলীয় এ বিশাল মিছিলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শরীক হন। অনেক প্রখ্যাত আলেম ও পীর মিছিলপূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং মাওলানা সাঈদী সাহেবের নেতৃত্বে তারা মিছিলেও যোগদান করেন।

তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরের দিন তাফসীর মাহফিলে মাওলানা সাঈদী ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৩ মার্চ মানিক মিয়া এভিনিউতে ইসলামী মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। অনেক উল্লেখযোগ্য দীনী ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাঈদীর নেতৃত্বে এক বিরাট আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত বলে বোঝা গেল। কারণ, এ ঘোষণার পর তাঁরা মাওলানার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে আরও উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। পত্রিকায় ১৩ মার্চ মহাসমাবেশ


www.icsbook.info

হবে বলে খবর প্রকাশিত হলো এবং ঐ সমাবেশ থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও আভাস দেওয়া হলো।

উল্লেখযোগ্য আলেম ও পীরগণ যারা তাঁর বাসায় গিয়ে ধরনা দিচ্ছিলেন এবং বারবার যাচ্ছিলেন তাদের নামও তিনি সেদিন আমাকে জানালেন। তবে সেসব নাম প্রকাশ না করার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বারবার ফোনে মাওলানা সাহেবকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, জামায়াত ও শিবিরের কেউ যেন মঞ্চে না ওঠে। যদি ওরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে তারা সেখানে থাকবেন না।

মাওলানা সাঈদী আমার নিকট এ কথাটি বলার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, জামায়াত-শিবিরকে বাদ দিয়ে আমাকে নেতা বানিয়ে তারা আন্দোলন করতে চান, একথা টের পাওয়ার সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত নিলাম, ঐ সমাবেশে আমি নিজেই যাব না।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর মজলিসে সাদারাতের বৈঠকে কে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে কথা মাওলানা সাঈদী স্মরণ করতে পারলেন না। তখন তাঁর এ কথাও মনে হয়নি যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনে তাঁকে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য ১৩ মার্চের মহাসমাবেশের আয়োজন থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

তিনি বললেন, জামায়াত-শিবিরই আমার ভিত্তি। আমি এ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা কখনো চিন্তাও করতে পারি না। তাই যারা আমাকে নেতা মেনে জামায়াত থেকে আলাদা করতে চায় তাদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য ১৩ মার্চের অনেক আগেই আমি বিদেশে চলে গেলাম। ঐ সমাবেশ আর হতে পারল না।

মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাতের যে বিবরণ আমি উল্লেখ করেছি তা তিনি স্মরণে রেখেছেন। এতে বোঝা গেল যে, প্রেস কনফারেন্স ঠিক ঐ সময় হতে যাচ্ছিল, যখন ১৩ মার্চের ব্যাপারে লোকজন তাঁর নিকট ধরনা দিচ্ছিলেন। এতদিন পর সব কথা দিন-তারিখসহ তাঁর স্মরণে না থাকাই স্বাভাবিক।

## পরিণামে ইত্তেহাদুল উম্মাহ অচল হয়ে গেল

মাওলানা সাঈদী প্রেসক্লাবে না যাওয়ার ফলে সাংবাদিক সম্মেলন হলো না এবং পরের দিন পত্রিকায় এ সম্পর্কে কোনো খবরও প্রকাশিত হলো না। কিছু দিন পর চরমোনাইর পীর সাহেবের নেতৃত্বে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামে একটা রাজনৈতিক দল কায়েম হলো। সাঈদী সাহেব পিছিয়ে না আসলে হয়তো 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' নাম ব্যবহার করেই এ আন্দোলন শুরু করা হতো।



www.icsbook.info

মাওলানা সাঈদী সাহেব ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে শরীক না হওয়ায় চরমোনাইর পীর সাহেব স্বাভাবিক কারণেই অসন্তুষ্ট হতে পারেন। ইত্তেহাদুল উম্মাহর মজলিসে সাদারাতের বৈঠকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মাওলানা সাঈদী এর পক্ষেই ছিলেন। তাই ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি তাতে শরীক না হওয়ায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাই বলে পীর সাহেব বিভিন্ন মাহফিলে সাঈদী সাহেবকে অশালীন ভাষায় যেরূপ গালাগালি করছেন তা কোনো দীনী ব্যক্তির মুখে মোটেই মানায় না।

এ ঘটনার পর ইত্তেহাদুল উম্মাহর অকাল মৃত্যু ঘটল। এ ঐক্যমঞ্চটি ৫ বছর পর্যন্ত দ্রুত উন্নতি করতে করতে হঠাৎ যেন বজ্রপাতের আঘাতে একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

এরপরও ঐক্যপ্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু যে ফর্মুলাতে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল সে ফর্মুলা আর চালু হয়নি। ঐ ফর্মুলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সামষ্টিক নেতৃত্ব (Collective Leadership)। অর্থাৎ সংগঠনের নেতৃত্ব এক ব্যক্তির হাতে নয়, সভাপতিমণ্ডলীর (Presidium) হাতে থাকবে। কেননা, এক্ষেত্রে কোনো দলের একজনকে নেতা মানা অন্যান্য দলের নেতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া নিজের নেতৃত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে যারা সংগঠনকে বিভক্ত করেন, তারা কেমন করে অন্য কাউকে নেতা মেনে নিবেন?

## 'ইসলামী ঐক্য' ময়দানের দাবি

কোটি কোটি মুসলিম জনতার মধ্যে যারা ইসলামের বিজয় কামনা করেন, যারা ইসলামী ঐক্যের কথা শুনলে উৎসাহবোধ করেন এবং নেতৃস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিবর্গকে একমঞ্চে দেখলে আবেগে উচ্ছ্বসিত হন তাদেরকে ইসলামী জনতা বা তাওহীদী জনতা নামে অভিহিত করা হয়। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, 'ইসলামী ঐক্য' ময়দানের তীব্র দাবি।

মুসলিম মিল্লাতের এ দীনী জযবা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ইসলামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা একমঞ্চে সমবেত হলেই ইসলামী ঐক্য বাস্তবে কায়েম হতে পারে, তাদের কারণেই ঐক্য সম্ভব হচ্ছে না; বরং তাদের নেতৃত্বের লোভের কারণেই জোট ও দলে ভাঙ্গন ঘটে চলেছে। ঐক্য না হওয়ার জন্য ইসলামী জনতার নিকট মূলত তারাই দায়ী।

১৯৮৭ সালে ইত্তেহাদুল উম্মাহর মঞ্চ ভেঙ্গে যাওয়ার পর ময়দানের দাবির কথা বিবেচনা করে আমি নতুন করে ঐক্যপ্রচেষ্টা চালাই। জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ-সদস্য এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলামকে আমি ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে সবচেয়ে আন্তরিক ও সিরিয়াস বলে মনে করেছি। তাই তাঁর উপর দায়িত্ব দিলাম এ ব্যাপারে আবার যোগাযোগ শুরু করার জন্য। তিনি ব্যারিস্টার মাওলানা



www.icsbook.info

কুরবান আলী ও মাসিক 'মদীনা' সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সাথে যোগাযোগ করে নতুন করে প্রচেষ্টা চালালেন। তাঁদের অবিরাম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৮৯ সালে একটি সর্বদলীয় শীর্ষ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

## বৃহত্তর ঐক্যের নতুন উদ্যোগ

১৯৮৯ সালে সকল ইসলামী দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠানের মহান উদ্দেশ্যে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী ও এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম প্রচেষ্টা চালান। শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হকের উপর আহ্বায়কের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁরা তিন জন অবিরাম মেহনত করে ঐ বছরই ১৪ আগস্ট ৮টি দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে পুরানা পল্টনের দেওয়ান মঞ্জিলে এক সম্মেলনে সমবেত করতে সক্ষম হন। শিল্পপতি জনাব শফিউদ্দীন দেওয়ান তাঁর নিজ বাড়িতেই বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মেহমানদারি করেন।
সম্মেলনে নিম্নলিখিত সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন :

১. খেলাফত মজলিস– শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক, মাওলানা আবদুল গাফফার ও অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক।
২. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন– চরমোনাইর পীর সাহেব মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম।
৩. নেজামে ইসলাম পার্টি– মাওলানা আশরাফ আলী ধরমণ্ডলী।
৪. জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম– মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও মাওলানা মুফতি ফজলুর রহমান।
৫. ইসলামী ঐক্য আন্দোলন– ব্যারিস্টার কুরআন আলী।
৬. তমদ্দুন মজলিস– অধ্যাপক আবদুল গফুর।
৭. শর্ষিনার পীর সাহেবের প্রতিনিধি– মাওলানা রূহুল আমীন খান।
৮. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ– অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

## শীর্ষ সম্মেলনের বিবরণ

শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হকের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। প্রথমেই তিনি সম্মেলনের আহ্বায়ক হিসেবে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। চরমোনাইর পীর সাহেব সভাপতিকে প্রশ্ন করেন, "হুজুর! আপনি তো ঐক্যের ডাক দিলেন, কিন্তু জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে যেসব ফতোয়া আছে তা ঐক্যের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না তো? আপনার নিজের লেখার মধ্যেও তো ঐসব ফতোয়ার সমর্থন আছে। এ অবস্থায় ঐক্য কেমন করে সম্ভব হবে?"


www.icsbook.info

এ প্রশ্নটি সম্মেলনে যে সমস্যার সৃষ্টি করল তার সমাধানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। ঐক্যের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আমি যে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলাম তার সারকথা নিম্নরূপ :

"আমার মতো আধুনিক শিক্ষিতদের ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে হলে ওলামায়ে কেরামের সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত কোনো উপায় নেই। আব্বা ও দাদা আলেম ছিলেন বলে ছোট সময় থেকেই ধার্মিক পরিবেশে গড়ে ওঠার সুযোগ পাই এবং বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে জানার কৌতূহল সৃষ্টি হয়। স্কুলজীবনেই মাসিক 'নেয়ামত' পত্রিকার মাধ্যমে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর ওয়াযের অনুবাদ আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর বইগুলো সংগ্রহ করে পড়ার পর আমার ধারণা হয় যে, ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। এমএ পরীক্ষা দিয়ে ১৯৫০ সালে তাবলীগ জামায়াতে তিনটি চিল্লা কাটানোর ফলে আমার মধ্যে এ মিশনারি জযবার সৃষ্টি হয় যে, ইসলাম ধর্মের খিদমতে গোটা জীবনটাই উৎসর্গ করা উচিত। ১৯৫২ সালে তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে ইসলামের জ্ঞানচর্চার সুযোগ পেয়ে বুঝতে পারলাম যে, ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল দিক ও সকল বিভাগের জন্যই সবচেয়ে উপযোগী। ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করলাম যে, ইসলাম এমন এক বিপ্লবী জীবনবিধান, যাকে মানব-রচিত যাবতীয় বিধানের উপর বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে এবং রাসূল (স)-এর অনুকরণে ইসলামী আন্দোলন করা মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এ সময় মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে হিন্দুস্তান থেকে উর্দুতে প্রকাশিত ফতোয়ার অনেকগুলো পুস্তিকা আমার কাছে পৌঁছে। তাবলীগ জামায়াতেই আমার উর্দু শেখার সূচনা হয়। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর মাওলানা মওদূদীর তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' অধ্যয়নের প্রয়োজনে উর্দু ভাষা ভালোভাবে শিখতে বাধ্য হই। কতক নামকরা আলেমের নামে প্রচারিত ফতোয়া পড়ে প্রথমে বেশ বিব্রতবোধ করি। তাফহীমুল কুরআন আমাকে এতটা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় যে, আমি ঐসব ফতোয়ার বক্তব্য যাচাই না করে গ্রহণ করা সঠিক মনে করিনি। তাই যেসব বই-এর কথিত উদ্ধৃতির ভিত্তিতে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে মাওলানা মওদূদীর সেসব বই যোগাড় করে ফতোয়ার সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করলাম। এ প্রচেষ্টা আমাকে ব্যাপক পড়াশোনার সুযোগ করে দিল।

বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে জানার ও বোঝার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর রচিত সাহিত্য আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিতদের সামনে একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত এ সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শাহাদাতের পবিত্র জযবা নিয়ে দাওয়াতে দীনের কাজে এগিয়ে এসেছে এবং অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে।



www.icsbook.info

মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের এ বিরাট অবদান সত্ত্বেও তাঁর রচনায় ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। তিনি রাসূলকে ছাড়া আর কাউকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে না করার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। তাই কী করে আমরা তাঁকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করতে পারি? ১৯৮১ সালে আমার লিখিত 'ইকামাতে দীন' বইটিতে ওলামা-মাশায়েখের খিদমতে এই মর্মে আবেদন জানাই যে, সংশোধনের নিয়তে কুরআন-হাদীসের দলিলের ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদীর রচনায় যেসব ভুল পাওয়া যায় তারা সেগুলো চিহ্নিত করে দিলে আমরা এ খিদমতের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে শামিল আছি বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এর খেলাফ কোনো কথা আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি নই।"

## সভাপতির মন্তব্য

আমার এ দীর্ঘ বক্তব্যের পর সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে শায়খুল হাদীস সাহেব বললেন, "অধ্যাপক সাহেব বল আমাদের কোর্টে ফেলে দিলেন। এখন এটা আমাদের দায়িত্ব। আমি অধ্যাপক সাহেবকে দীর্ঘকাল থেকে জানি এবং সদর সাহেব হুযুরের [মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)] সাথে তাঁর সম্পর্কের কারণে আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি মাওলানা মওদূদীর রচনায় ভুল চিহ্নিত করে দেই তাহলে তিনি জামায়াতের মধ্যে তা কাজে লাগাতে পারবেন। সুতরাং এসব বিষয়ে আর আলোচনা না করে আসুন ঐক্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলি।"

সভাপতি সাহেব এ কথা বলার পর ঐক্যের পক্ষে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ঐক্যের প্রক্রিয়া চালু রাখার উদ্দেশ্যে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি রাবেতা কমিটি গঠিত হয়; কিন্তু সদস্যদের প্রয়োজনীয় তৎপরতার অভাবে তখন ঐক্যের কোনো বাস্তব রূপরেখা সামনে আসেনি। ১৯৯০ সালের ১ মে ঈদুল ফিতরের দিন সন্ধ্যায় ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলীর বাসায় শায়খুল হাদীস, চরমোনাইর পীর সাহেব, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, অধ্যক্ষ মাসউদ খান এবং আমি একসাথে মিলিত হওয়ার সুযোগে ইসলামী ঐক্যের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, রাবেতা কমিটি ১০ জনের বদলে ৫ জন হবে, যাতে যোগাযোগ সহজ হয়।

**এ পাঁচ জন হলেন–**

১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

২. ব্যারিস্টার মাওলানা কুরআন আলী।

৩. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

৪. জনাব ডা. মুখতার আহমদ (চরমোনাইর পীর সাহেবের প্রতিনিধি)।

৫. অধ্যক্ষ মাসউদ খান (খেলাফত মজলিসের প্রতিনিধি)।

এরপর এ বিষয়ে আর কোনো তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি।



www.icsbook.info

এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলামকে যখনই এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন, "আমি উদ্যোগ নিলে যোগাযোগ হয় বটে, কিন্তু সবাই সক্রিয় না হলে কেমন করে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে?"

## চরমোনাইর পীর সাহেব আমার বাড়িতে এলেন

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক শুক্রবার সকালে পীর সাহেব ও ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী আমার বাড়িতে তাশরীফ আনলেন। হঠাৎ করেই হাজির হওয়ায় তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিনা খবরেই কী মনে করে এলেন?'

এর জবাবে দুজনের মধ্যে কে কথা বলবেন তা নিয়ে কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি হলো। পীর সাহেব বলতে থাকলেন, 'ব্যারিস্টার সাহেব বলেন'। আর ব্যারিস্টার সাহেব বারবার বললেন, 'হুজুর বলেন'। শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টার সাহেব বলা শুরু করলেন।

বুঝতে পারলাম, কোন্ বিষয়ে আমার সাথে আলাপ করা হবে তা দুজনেই পরামর্শ করে ঠিক করে এসেছেন। এখন কে কথা বলবেন তা নিয়ে সামান্য একটু ঠেলাঠেলি হলো।

ব্যারিস্টার সাহেব বললেন, "প্রফেসর সাহেব! আপনি তো বিদেশ থেকে আসার পর থেকেই ইসলামী ঐক্যের জন্য বই লিখলেন এবং অনেক চেষ্টা করলেন; কিন্তু এখনও কাঙ্ক্ষিত ঐক্য গড়ে উঠল না। আপনি কোনো এক ব্যক্তির একক নেতৃত্বের বদলে সামষ্টিক নেতৃত্ব বা সম্মিলিত নেতৃত্বের ভিত্তিতে ঐক্যের চেষ্টা করেছেন; কিন্তু এক ব্যক্তিকে নেতা না মানলে প্রকৃত ঐক্য হতে পারে না।

নেতৃত্বের দায়িত্ব এমন একজনের হাতে তুলে দিতে হবে, যিনি একই সাথে আলেম ও পীর। আমি আলেম হলেও পীর নই। আর আপনি তো আলেমও নন, পীরও নন। আমাদের দেশে যে ক'জন ব্যক্তিত্ব আলেম ও পীর হিসেবে গণ্য তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ হুযুরের (পীর সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে) চেয়ে যোগ্য অন্য কেউ নেই।"

পীর সাহেবের উপস্থিতিতে এ কথাগুলো শুনে আমি হতভম্ব অবস্থায় পীর সাহেবের দিকে তাকালাম এবং নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে, ব্যারিস্টার সাহেবের বক্তব্যে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তাঁর উৎফুল্ল চেহারা এখনও আমার চোখে ভাসছে।

আমি বিব্রত অবস্থায় ব্যারিস্টার সাহেবকে বললাম, "আপনার প্রস্তাব শুনলাম। আমার সহকর্মীদের নিকট বিষয়টা পেশ করব।"

তাঁরা বিদায় নিয়ে গেলে আমি ভাবতে থাকলাম, ব্যারিস্টার সাহেব একা এসেই তো এ কথাগুলো আমাকে বলতে পারতেন। তিনি পীর সাহেবের সামনেই এভাবে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানালেন বলে আমি চরমভাবে বিস্মিত হলাম। আর পীর সাহেবই বা কেমন করে তাঁর সামনেই এসব কথা ব্যারিস্টার সাহেবকে বলতে



www.icsbook.info

দিলেন সেটা আরও বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার। আর তাঁর পক্ষে এমন ওকালতিতে পীর সাহেবকে খুশি হতে দেখে তো আমি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করলাম।

তাঁরা দুজন বিদায় নেওয়ার পরপরই আমি জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে ফোনে ঘটনাটা জানালাম। কুরবান সাহেবকে নিজামী সাহেব বড় ভাইয়ের মতোই শ্রদ্ধা করেন। তিনি তাঁকে ফোনে জিজ্ঞেস করলেন, "কুরবান ভাই! আপনি আমীরে জামায়াতের নিকট যে কথা বলে এলেন সে কথাটি আগে আমাকে বললেই ভালো হতো।" কুরবান সাহেব নাকি জবাব দিলেন, "এটাকে আপনি এত সিরিয়াসলি নেবেন না, পীর সাহেবকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমি এ কথা বলেছি।" এ কথা জেনে আমি আরও বিস্মিত হলাম।

ব্যারিস্টার কুরবান সাহেবের সাথে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহু বছর থেকে। পঞ্চাশের দশকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে যখন পূর্ব-পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ গঠিত হয়, তখন তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। তিনি পীর সাহেবকে যখন নিয়ে আসেন তখন তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রধান নেতা।

কয়েক বছর পর তিনি আবার এসে প্রস্তাব দিলেন যে, একটা সর্বদলীয় ঐক্যজোট করা হোক এবং প্রত্যেক দলের প্রধানকে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদের জন্য জোটপ্রধান করা হোক। তবে প্রথম জোটপ্রধান করা হোক চরমোনাইর পীর সাহেবকে।

আমি বললাম, আপনি আলেম মানুষ। আপনি কি জানেন না যে, ইসলামে নেতৃত্বের খাহেশ রাখা জায়েয নয়? জওয়াবে তিনি বললেন, অবশ্যই আমি এ কথা জানি। আবার জিজ্ঞেস করলাম, চরমোনাইর পীর সাহেব নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী কি না? বললেন, তিনি চরম নেতৃত্বলোভী। বললাম, তাহলে আপনি এমন প্রস্তাব নিয়ে এলেন কেমন করে? বললেন, আমি চাই, তবুও ঐক্যজোট হোক।

ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী সাহেব জীবিত থাকলে (মৃত্যু ২০০৫) আমার উপরিউক্ত বিবরণ সত্যায়িত করতে পারতেন। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে এসব সত্য প্রকাশ করছি।

## কারাগারে বন্দী থেকেও ইসলামী ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা

১৯৯০ সালের শেষার্ধে কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবিতে দুবার আন্দোলনের ফলে স্বৈরশাসক এরশাদ ৬ ডিসেম্বর পদত্যাগ করলেন, কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং জামায়াতের সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করতে সম্মত হয়। এ সময় ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা মুলতবিই রইল।



www.icsbook.info

১৯৯২ সালের ২৪ মার্চ বিদেশী নাগরিক হিসেবে আমাকে গ্রেফতার করা হলো। আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৯৯৩ সালের জুলাই পর্যন্ত রাজবন্দী হিসেবে ছিলাম। ১৬ মাস বন্দী থাকাকালে ১৬টি বই লিখি। আর 'ইসলামী শক্তির ঐক্যমঞ্চ চাই' বলে একটি প্রবন্ধ রচনা করি। কারামুক্ত হওয়ার পর 'ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করি এবং সংশ্লিষ্ট মহলে তা বিলি করা হয়, যাতে এ বিষয়ে কেউ উদ্যোগ নিতে চাইলে এটাকে একটা ফর্মুলা হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন।

আমার প্রণীত পূর্ববর্তী ফর্মুলা অনুযায়ী আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে ওলামা ও মাশায়েখের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একজন আলিয়া মাদরাসা-পাস আলেমকে নিয়োজিত করি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেওয়ারও ব্যবস্থা করি। কিন্তু জেলে লেখা ফর্মুলাটির ভিত্তিতে আমি কোনো উদ্যোগ নিতে হিম্মত করিনি।

ইত্তেহাদুল উম্মাহ ভেঙ্গে যাওয়ার পর ১৯৮৯ সালে যে সর্বদলীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার উদ্যোগ আমিই নিয়েছিলাম। সম্মেলনের সাফল্য থেকে ধারণা করা হয়েছিল ছিল যে, ১০ জনের রাবেতা কমিটি এবং পরবর্তীতে ৫ জনের রাবেতা কমিটি সক্রিয় হবে এবং তাদের প্রচেষ্টায় আবার একটা ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠবে। কিন্তু সে ধরনের কোনো প্রচেষ্টাই আর চালু হয়নি বলে আমি হিম্মত হারিয়ে ফেলি। জেলে প্রণীত ফর্মুলাটি এখানে পেশ করছি।

## ইসলামী শক্তির ঐক্যমঞ্চ চাই

১৯৯২ সালের মার্চ থেকে '৯৩ সালের জুলাই পর্যন্ত ১৬ মাস জেলে থাকাকালে আমি ইসলামী ঐক্যের গুরুত্ব আরও বেশি উপলব্ধি করি এবং সকল দীনী মহলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এ আশা নিয়ে একটা ঐক্য-প্রস্তাব রচনা করি। সকলের বিবেচনার জন্য এখানে তা পেশ করা হলো :

আল্লাহর রহমতে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে ইসলাম একটি শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদসহ সকল বাতিল শক্তি একজোট হয়ে 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি' নিষিদ্ধ করার দাবি এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ দেশে ইসলাম বিজয়ী হওয়ার আতঙ্ক তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

তাদের এ আশঙ্কা অমূলক নয়। জনগণের নিকট ভোট ভিক্ষা করার সময় লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও বিসমিল্লাহর আশ্রয় নেওয়াটা তারা নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করে; কিন্তু ইসলামের কোনো ধার তারা ধারে না। এ অবস্থায় জনগণের সামনে ইসলামী হুকুমতের আওয়াজ জোরদার হলে ময়দান তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এ আশঙ্কা করাই তাদের জন্য স্বাভাবিক। বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন নামে ও স্লোগানে ইসলামী শাসন কায়েমের যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তার লক্ষ্য যে আসলে


www.icsbook.info

একই, সে কথা বাতিলপন্থিদের অজানা নয়। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন, ইসলামী খিলাফত, ইসলামী শাসনতন্ত্র ইত্যাদির মর্মকথা যে একই তা উপলব্ধি করেই শতমুখে তারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা ও মৌলবাদের নামে সবরকম ইসলামী আন্দোলনকে নির্মূল করার পাঁয়তারা করছে।

আনন্দের বিষয় যে, সকল ইসলামী সংগঠনই বলিষ্ঠ ভাষায় এসব ষড়যন্ত্র ও অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসব প্রতিবাদ পৃথক পৃথকভাবে হওয়ায় তাতে বাতিলের গায়ে সামান্য আঁচড়ও লাগছে না। বাতিল শক্তি জাতীয় সংসদেও একই কণ্ঠে তাদের এ দাবি জানিয়ে যাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে ইসলামী শক্তি যদি একই মঞ্চ থেকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েমের বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলতে সম্মত হয় তবেই জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগবে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে বাইতুল মুকাররম চত্বরে জাতীয় মসজিদের খতীবের সভাপতিত্বে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব একই মঞ্চ থেকে কথা বলায় তাতে যে বিপুল সাড়া পড়েছিল, তা এককভাবে কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। মাত্র দুদিনের নোটিশে এভাবে লাখো লোকের সমাবেশ অনেককেই বিস্মিত করেছে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, একমঞ্চে প্রধান প্রধান ইসলামী ব্যক্তিত্ব যদি সমবেত হন তাহলে গোটা দেশে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হতে পারে। ইসলামী আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টির জন্য এর প্রয়োজন কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

### ঐক্যমঞ্চের উদাহরণ

ইন্দিরা গান্ধীর দাপটের সময়ও ভারতের সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ 'মজলিসে মুশাওয়ারাত' নামে একমঞ্চে সমবেত হওয়ায় সেখানকার মুসলিম জনতার তিন দফা দাবি আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। দাবিগুলো হলো :

১. মুসলিম পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।
২. উর্দু ভাষাকে শাসনতন্ত্রে দেওয়া মর্যাদা অনুযায়ী বহাল রাখতে হবে।
৩. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া চলবে না।

১৯৫১ সালে সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার কারণে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শ প্রস্তাব স্থায়ী মর্যাদায় বহাল রয়েছে। এমনকি ১৯৭৩ সালে মি. ভুট্টোর আমলে প্রণীত শাসনতন্ত্রেও আদর্শ প্রস্তাব ও ২২ দফাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি।

এসব উদাহরণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামী সংগঠন ও নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের সমবেত সিদ্ধান্তকে শাসকগণ অবহেলা করতে সাহস পায় না।



www.icsbook.info

বাংলাদেশের ইসলামী শক্তি যদি একমঞ্চে দাঁড়িয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রয়োজনীয় সব ইস্যুতে ঐকমত্য প্রকাশ করে তাহলে জনগণ নিশ্চিতভাবে তা সমর্থন করবে এবং কোনো সরকারের পক্ষেই এ জনমতকে অবহেলা করা সম্ভব হবে না। আর তখন ইসলামবিরোধী এবং অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা ইসলামের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহসও করবে না।

এ উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো মঞ্চে যারা শামিল হবেন তারা তাদের নিজস্ব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যথারীতি চালু রেখেই শুধু একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী একমঞ্চ থেকে আওয়াজ তুলবেন। এ কর্মসূচি 'আল আমরু বিল মা'রূফ ওআন নাহী আনিল মুনকার'-এর ভিত্তিতেই প্রণীত হতে হবে। আল্লাহ তাআলা এ কাজের মাধ্যমেই মুসলিম জাতিকে 'খাইরু উম্মাত' তথা শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন।

## ইসলামী ঐক্যের দু'দফা কর্মসূচি

'আল আমরু বিল মা'রূফ ওআন নাহী আনিল মুনকার'-এর ভিত্তিতে দু'দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। এ দফাদুটির একটি করে সহজবোধ্য নামও দেওয়া যেতে পারে। যথা :

**১. ইসলামের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন :** যেহেতু ইসলাম কতক বাহ্যিক অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ কোনো ধর্মমাত্র নয়; বরং একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনবিধান, সেহেতু বিভিন্ন ইস্যুতে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক মতামত বা সিদ্ধান্ত সরকার ও জনগণের সামনে পেশ করা প্রয়োজন। কেননা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অগণিত বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে এমন সব মতামত প্রকাশ করা হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় বলে আলেম সমাজ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ইসলামী সমাধান কী তাও বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন পড়ে।

এ পরিস্থিতিতে ইসলামের পক্ষ থেকে সঠিক ভূমিকা পালন করার কোনো সর্বসম্মত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন না থাকার ফলে ইসলাম সম্পর্কে যে যা খুশি তা প্রকাশ করে চলেছে। যাদের ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই তারাও ইসলামের অথরিটি সাজার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ইসলামকে এ ইয়াতীম দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট মতামত জাতির সামনে আসা অতীব প্রয়োজন।

যদি ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের ব্যাপকভিত্তিক কোনো ঐক্যমঞ্চ থেকে কোনো বিষয়ে ইসলামের রায় প্রকাশ করা হয়, তাহলে সরকারসহ কোনো মহলই এ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করার কিংবা কোনো দায়িত্বহীন বক্তব্য দেওয়ার সাহস পাবে না।


www.icsbook.info

www.icsbook.info

১৯৪১ সালে ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়। ১৯৫৩ সালে ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্দেশ্যে নেজামে ইসলাম পার্টি গঠিত হয়। ৮০-এর দশকে আরও কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এসব ক'টিতে ওলামায়ে কেরাম সক্রিয় রয়েছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ আলেম এখনও সংগঠনের বাইরেই রয়ে গেছেন। এটা অত্যন্ত স্বস্তির বিষয় যে, বিলম্বে হলেও ফরযিয়াতে ইকামাতে দীনের চেতনা আলেম সমাজের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ চেতনার ফলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে ইসলামী ঐক্যের প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এ আশা পূরণ করুন। আমীন!

## ইসলামী ঐক্যের বাস্তব ফর্মুলা

বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন, প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে কোনো ঐক্যমঞ্চ গঠন করতে হলে এর স্থায়িত্ব ও সঠিক পরিচালনার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই কয়েকটি মূলনীতি মেনে চলা আবশ্যক বলে আমি মনে করি :

১. সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের উপর ঐক্যমঞ্চের নেতৃত্ব যৌথভাবে ন্যস্ত থাকবে। কোনো একজনের উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হবে না।
২. ঐক্যমঞ্চে শরীক সংগঠনসমূহ নিজ নিজ সংগঠনের কার্যক্রম যথারীতি চালু রাখতে পারবে।
৩. ঐক্যমঞ্চের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হবে।

## ঐক্যমঞ্চের বিকল্প ঐক্য পদ্ধতি

সকল ইসলামী শক্তির একটি ঐক্যমঞ্চ গঠনের প্রচেষ্টা সফল না হওয়া পর্যন্ত একই ধরনের কর্মসূচি যুগপৎভাবে পালনের মাধ্যমে ঐক্যকামী জনগণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ইসলামী সংগঠনগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা না করে যুগপৎ কর্মসূচি চালিয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকবে।

## চরমোনাইর মুহতারাম পীর সাহেবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত চরমোনাইর মুহতারাম পীর মাওলানা সাইয়েদ ফযলুল করীমের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির কৃতিত্ব পীর সাহেবেরই, আমার নয়।

১৯৭৮ সালে আমার রচিত 'ইসলামী ঐক্য : ইসলামী আন্দোলন' বইটি তাঁর ভগ্নিপতি মাওলানা বেলায়েত হোসাইনের মারফতে তাঁর নিকট পাঠাই। তাঁর সাথে



www.icsbook.info

আমার সরাসরি পরিচয় ছিল না। তাঁর সম্মানিত পিতা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাকের সভাপতিত্বে পরিচালিত কয়েকটি মাহফিলে আমার বক্তব্য শুনে তিনি আমার সাথে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা সত্ত্বেও বর্তমান পীর সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠার বিবরণ দিচ্ছি। আমার প্রেরিত বইটি পড়ে তিনি কোনোরূপ সংবাদ না দিয়েই আমার বাড়িতে আগমন করেন এবং অত্যন্ত খোলা মনে বলেন, আপনার বইটি পড়ে আপনার সাথে আমার চিন্তার গভীর মিল রয়েছে দেখে আপনার কাছে ছুটে আসতে বাধ্য হলাম। আমি অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করলাম যে, ইসলামী ঐক্যের ফর্মুলাটি তিনি পছন্দ করেছেন।

ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালে যোগাযোগ ও চিন্তা-ভাবনা করার জন প্রথমে যে কয়েকজনকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে যখন ইত্তেহাদুল উম্মাহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন সবাই এ পীর সাহেবকেই এর মুখপাত্র নির্বাচিত করেন।

একবার ঘটনাক্রমে পীর সাহেব আমার বাড়িতে এলেন। ইসলামী ঐক্যের অগ্রগতি নিয়ে আলাপ চলছিল। ওলামা ও মাশায়েখের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালনকারী আলেমে দেওবন্দ ও উজানী কাওমী মাদরাসার সাবেক মুহতামিম মাওলানা মাযহারুল হকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার আপন ভাগ্নি-জামাই আলেমে দেওবন্দ মাওলানা হাফেয ফযলুল হকও আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর পকেট থেকে নোট বই বের করে মাওলানা মওদূদীর বই থেকে এমন একটা উদ্ধৃতি পেশ করলেন, যা শুনে পীর সাহেব স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। যে বইটি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো, উর্দুতে লেখা সে বইটি আমি বের করে তাঁর উল্লিখিত পৃষ্ঠা নম্বর বের করলাম। মাওলানা মাযহার সাহেবকে ঐ প্যারাটি পড়তে দিলাম। তিনি পড়ার পর পীর সাহেব ধমকের সুরে আমার ভাগ্নি-জামাইকে বললেন, "আগে-পিছে বাদ দিয়ে আপনি কেন এমন একটি উদ্ধৃতি পেশ করলেন, যা শুনে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হয়েছিল। বই থেকে পড়ার পর তো তাতে আপত্তিকর কিছু দেখছি না। আপনি এতে দূষণীয় কী পেলেন?

ঐ ব্যক্তি আরও একটি উদ্ধৃতি পেশ করলেন। বই বের করে দেখার পর সেটারও ঐ একই দশা হলো। পীর সাহেব তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আর দরকার নেই'। আমি অত্যন্ত সন্তুষ্টিবোধ করলাম যে, পীর সাহেব প্রমাণ পেয়ে গেলেন একশ্রেণীর আলেম মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই তাঁর লেখা থেকে কাটছাট করে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করে থাকে।



www.icsbook.info

১৯৮৩ সালে পীর সাহেব একদিন এসে বললেন, আপনাকে আমি হাফেযজী হুযুরের কাছে নিয়ে যেতে চাই। আমি তাঁর উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তিনি বললেন, ইত্তেহাদুল উম্মাহতে জামায়াতের সাথে মিলে আমি যে কাজ করছি সেটা তিনি মোটেই পছন্দ করছেন না। আমি তাঁকে বোঝাতে পারছি না। বললাম, আপনি যদি বোঝাতে না পারেন, তাহলে আমি কেমন করে পারব? তিনি বললেন, আমি চাই আপনার মুখ থেকেই তিনি যেন এ সম্পর্কিত বক্তব্য শুনেন। আমি রাজি হলাম। দিন-তারিখ-সময় ঠিক করে তিনি জানালেন। কথা ছিল তিনি গাড়ি নিয়ে এসে সকাল দশটায় আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি প্রস্তুত হয়ে রইলাম। ৯টার সময় তিনি ফোন করে বললেন, গতরাতে হাফেযজী হুযুর ইরান সফরে চলে গেছেন। অতএব এ সাক্ষাৎ আর তখন হলো না।

অবশ্য ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে হাফেযজী হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং সেখানে পীর সাহেব ঐক্যের পক্ষে হাফেযজী হুযুরের প্রতি আবেদন জানান। অবশ্য হাফেযজী হুযুর সে আবেদনে সাড়া দেননি।

১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পীর সাহেব আমার বাড়িতে এলেন। বললেন, গোলাম আযম ও হাফেযজী হুযুরকে একত্রিত করতে না পারলে ইসলামী ঐক্য পূর্ণাঙ্গ হবে না। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমাকে যা করতে বলবেন আমি তা-ই করব। আর আমার কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে বলুন। তিনি বললেন, হুযুরকে যে বোঝাতেই পারছি না।

এক সাক্ষাতে পীর সাহেবকে আমি বললাম, আপনি জামায়াতের ব্যাপারে আমার সামনেই খোলা মনে সমালোচনা করেন। তাই আমি আপনাকে অন্তর থেকে ভালোবাসি। কেননা এটাই হলো সংশোধনের সঠিক তরিকা।

এভাবে পীর সাহেবের সাথে দশ বছরে আমার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটাকে আমি মহব্বতের সম্পর্ক বলেই মনে করি।

তিনি বহুবার মেহেরবানী করে আমার বাড়িতে এসেছেন। আমি কয়েকবার তাঁকে বলেছি, আপনি সদরঘাটে যেখানে এসে ওঠেন সেখানে আমি যেতে চাই। তিনি বললেন, আপনি সেখানে গেছেন লোকেরা তা টের পেলে ভিড় করবে, তাই আমি আপনাকে সেখানে নিতে চাই না।

একবার বরিশাল থেকে স্টিমারে ঢাকায় আসতে ঘটনাক্রমে একই কেবিনে রাত কাটালাম এবং সেই সুযোগে আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে দীর্ঘসময় আলাপ-আলোচনা হলো।



www.icsbook.info

তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার মতো কোনো ঘটনা কোথাও ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ে না। জামায়াতে ইসলামীর প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির কারণও আমার জানা নেই।

পীর সাহেবের উপস্থিতিতে ব্যারিস্টার কুরবান সাহেব তাঁর নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যমঞ্চ গঠনের যে প্রস্তাব দিলেন, তা জামায়াত গ্রহণ করেনি এবং আমিও ব্যক্তির বদলে সামষ্টিক নেতৃত্বের পক্ষে বলে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারিনি। এ অপরাধটুকু (!) ছাড়া আমার পক্ষ থেকে আর কোনো ত্রুটি হয়েছে বলে আমি জানি না। তাই ঐ ঘটনাটি এত বছর পর প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করলাম।

## ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় আলেমগণকে চিঠি

জামায়াতে ইসলামীর 'ওলামা ও মাশায়েখ বিভাগ' থেকে কয়েকজন আলেম ইসলামী ঐক্যের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন জেলা সফর করেন। ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ও এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম সফর করেন। চট্টগ্রামের জামায়াত-নেতা মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন, মাওলানা আবু তাহের ও মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী উপরিউক্ত দু'জন কেন্দ্রীয় নেতাকে নিয়ে হাটহাজারী ও পটিয়ার বিখ্যাত দুটো মাদরাসার মুহতামিমদ্বয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা জামায়াতের এ ডেলিগেশনকে সম্মানিত মেহমান হিসেবেই গ্রহণ করেন এবং আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশেই এঁদের সাথে মতবিনিময় করেন। তাঁদের নিকট আমার নিম্নরূপ চিঠি হস্তান্তর করা হয় :

২৪/১১/'৯৫ সাল

"মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

দেশের অন্যতম প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান হিসেবে আপনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। এর সাথে সাথে ইসলামী পুনর্জাগরণের বিভিন্ন বিষয়ে আপনি আরও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করছেন। এজন্য জানাই মুবারকবাদ।

বর্তমানে দেশে ও বিদেশে মুসলিম জনগণের সাথে ইসলামবিরোধী ইহুদী-নাসারাদের দুশমনি সম্পর্কে আপনি অবহিত আছেন।

আমাদের এই দেশে আমরা মনে করি, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র, ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ ও পীর-মাশায়েখ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।



www.icsbook.info

আমরা ঐক্যের জন্য সব সময় চেষ্টা করে আসছি। আমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি কার্যকর পন্থা বের করতে পারি। এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করে আমার প্রতিনিধির মাধ্যমে আপনার খিদমতে এ চিঠি প্রেরণ করলাম।"

তাঁরা আমার চিঠি গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে জবাব দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁরা জামায়াতের ডেলিগেশনকে চমৎকার মেহমানদারি করেন।

**আমার চিঠির জবাব**

আমার চিঠি দু'জনের নিকট একই ধরনের হলেও দু'জনের কাছে আলাদা আলাদাভাবে পেশ করা হয়। অবশ্য তাঁরা দু'জন একই কাগজে আমার চিঠির জবাব দেন। সম্মানিত মুহতামিমদ্বয়ের জবাবের কপি এখানে পরিবেশন করা হলো :

"বরাবর

মোহতারাম জনাব গোলাম আযম সাহেব

আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

স্মারক নং মৌ/হা-প৩১৩ তাং ১৯/১২/৯৫ ইং

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

**বিষয় : দ্বীনী স্বার্থে ঐক্য প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে**

সূত্র : আপনার প্রেরিত পত্র স্মারক নং ..... তাং ২৪-১১-৯৫ ইং

জনাব,

আপনার উপরিউক্ত তারিখের স্মারক নং সম্বলিত পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। পত্রে আপনি দেশ ও সমাজের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে ইসলামপন্থিদের ঐক্যের প্রতি যে গুরুত্বারোপ করেছেন তজ্জন্য আপনাকে জানাই ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আমাদের মতামত নিম্নরূপ :

ঐক্যের প্রশ্নে পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময়ের পূর্বে ঐক্যের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ অপরিহার্য। আপনার পত্রের মর্মানুসারে, দেশ ও সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা, অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ এবং একটি সত্যিকারের ইসলামী সরকার গঠন করাকেই ঐক্যের মূল লক্ষ্য বলা যায়। আপনি এ বিষয়ে অবশ্যই ঐকমত্য পোষণ করবেন যে, সত্যিকারের ইসলাম বলতে সেই দীনকে বুঝায় যা অবলম্বনে ও প্রতিষ্ঠায় আমরা ফেরকায়ে নাজিয়া (নাজাতপ্রাপ্ত দল)-এর অন্তর্ভুক্ত থাকার সৌভাগ্য লাভ করি। ফেরকায়ে নাজিয়ার বিবরণ প্রদান



www.icsbook.info

করা হয়েছে নিম্নবর্ণিত হাদীস শরীফে :

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ফেরকা ছাড়া সকলেই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা (ফেরকায়ে নাজিয়া) কোন্ দলটি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, সেই ফেরকা যেটি আমার ও আমার সাহাবীদের মতাদর্শের অনুসারী হবে।' (তিরমিযী)

এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স) এবং তাঁর সকল সাহাবায়ে কেরামকে আদর্শ হিসেবে যারা গ্রহণ করবে তারাই ফেরকায়ে নাজিয়া। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াতের বুনিয়াদী আকীদাগুলোর অন্যতম হচ্ছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকল নবী-রাসূল মাসুম (নিষ্পাপ) এবং সকল সাহাবায়ে কেরাম আদেল ও মুসলিম উম্মাহর আদর্শ। এটাকে সংক্ষেপে ইসমাতে আম্বিয়া ও আদালতে সাহাবা বলা যায়।

অতএব যদি আপনারা দেশে প্রকৃত ও সঠিক দীন কায়েমের স্বার্থে নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে একমত আছেন বলে লিখিতভাবে জানান অর্থাৎ–

১. ইসমাতে আম্বিয়া,

২. আদালতে সাহাবা,

৩. ইসলামী পদ্ধতিতে ইসলামী রাজনীতি করা এবং পাশ্চাত্য কর্মপন্থা বর্জন করা এবং

৪. জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে মাওলানা মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারাকে জড়িত করা হবে না বলে ঘোষণা দেওয়া;

–তবে আমরা দীনের বৃহত্তর স্বার্থে বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে আপনাদের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত রয়েছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হক অনুধাবনে ও হক প্রতিষ্ঠার মানসে নিঃস্বার্থ প্রয়াস ও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের তাওফীক দান করুন। আমীন!

স্বাক্ষর
মুহতামিম
জামেয়া আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

স্বাক্ষর
মুহাতামিম
আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া
চট্টগ্রাম



www.icsbook.info

## তাঁদের চিঠির জবাব

দু'জন মুহতামিমের চিঠি একসাথে পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ করি। কিন্তু ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে 'কেয়ারটেকার সরকার' আন্দোলনে মহাব্যস্ত থাকায় ঐ চিঠির জবাব দিতে ২ মাস দেরি হয়ে যাওয়ায় আমি লজ্জিত। আমার জবাবের নকল নিম্নরূপ :

**"মুহতারামদ্বয়,** ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমার বিগত ২৪/১১/৯৫ তারিখের পত্রের উত্তরে আপনাদের নিকট থেকে উপরিউক্ত বিষয়ে উল্লেখিত পত্রখানা ২৭/১২/৯৫ তারিখে আমার হস্তগত হয়। আপনাদের জবাবে উপরিউক্ত বিষয়ের প্রতি আপনারা যে গুরুত্বারোপ করেছেন সেজন্য আপনাদেরকে মুবারকবাদ জানাই।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় আমার ব্যস্ততার দরুন আপনাদের চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি আপনারা আমার সমস্যা উপলব্ধি করছেন।

আপনাদের পত্রে প্রকৃত ও সঠিক দীন কায়েমের স্বার্থে যে ৪ (চার)টি বিষয়ে আমাদের একমত থাকা সম্পর্কে লিখিতভাবে জানানোর কথা বলেছেন, তন্মধ্যে ১ ও ২ নং বিষয়ে আমাদের আকিদা ও বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সম্পূর্ণ অনুরূপ অর্থাৎ আমরা ইসমাতে আম্বিয়া ও আদালতে সাহাবায় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।

শেষোক্ত বিষয় ২টি সম্পর্কেও নীতিগতভাবে আমরা একমত। আমরা ইসলামী পদ্ধতিতেই ইসলামী রাজনীতি করছি। যেসব পাশ্চাত্য কর্মপন্থা ইসলামসম্মত নয় তা অবশ্যই বর্জনীয়। তবে এ বিষয়ে কেউ আমাদের কোনো কর্মপন্থা ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর হিসেবে ধরিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই তা আলোচনাসাপেক্ষে গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না।

চতুর্থ বিষয়ে জানাচ্ছি যে, মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোক্তা বটে, কিন্তু জামায়াতের গঠনতন্ত্র বা কর্মনীতি তাঁর একক চিন্তাপ্রসূত নয়। জামায়াতের জন্মলগ্ন থেকেই শূরা পদ্ধতিতে এর যাবতীয় কর্মতৎপরতা ও নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। ইসলামের মৌল বিষয়ে মরহুম মাওলানার কোনো ব্যক্তিগত মত, রায় বা বিশ্লেষণকে জামায়াতের মত, রায়, বিশ্বাস বা অনুসরণীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। মরহুম মাওলানাকে জামায়াত কখনও ফিকহ ও আকায়েদের ইমাম



www.icsbook.info

হিসেবে গণ্য করেনি। এ বিষয়টি আমি আমার লিখিত পুস্তকাদিতে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছি।

মাওলানা মরহুমের অগণিত সাহিত্যভাণ্ডার দ্বারা বহু ভাষায় বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ উপকৃত হচ্ছেন। আমরা শুধু তাঁর বইকেই যথেষ্ট মনে করি না, ইসলামের অন্যান্য মনীষীর লেখা কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিষয়ক এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর লিখিত কিতাবাদি থেকেও ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করি। মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেবের ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে ইসলামের মৌল বিষয়ে জামায়াতের কর্মনীতি হিসেবে জড়িত করা হয়েছে মর্মে কোনো প্রমাণ পেশ করলে তা অবশ্যই আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব।

ইসলামের সীমারেখার মধ্যে বহু বিষয়ে ইখতিলাফ বা মতবিরোধের অবকাশ ছিল ও রয়েছে। মুসলমানগণ মৌল বিষয়সহ অগণিত বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা সত্ত্বেও ইখতিলাফী বিষয়গুলো দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত হওয়ায় যুগে যুগে মুসলিম বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক। আমার পত্রে আমি উল্লেখ করেছিলাম, 'আমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১টি কার্যকর পন্থা বের করতে পারি।'

আপনারা আপনাদের পত্রে ৪টি বিষয়ে পূর্ব ঘোষণার প্রস্তাব করেছেন। যেকোনো আলোচনায় পূর্ব প্রস্তাব পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ বৃদ্ধি করে। তথাপি আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের লক্ষ্যে এবং দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে নাজাতের উদ্দেশ্যে আমি ও আমার দল আপনাদের উল্লেখিত যৌথ পত্রকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি। দেশ ও মিল্লাতের বর্তমান নাজুক অবস্থায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার লক্ষ্যে গঠনমূলক পরবর্তী কী কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামতের ইন্তেযারে রইলাম।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেশের সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্য সফল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আমার পত্রের জবাব দেওয়ার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানিয়ে ইতি টানছি।"

## আমার চিঠির পর–

মুহতামিম সাহেবদ্বয়ের চিঠির জবাব দেওয়ার পর কয়েক মাস নির্বাচনী হাঙ্গামায় কাটল। তাঁদের পক্ষ থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে ১৯৯৬-এর নির্বাচনের পর যোগাযোগ করে জানতে পারলাম, তাঁদের দু'জনের একজন আরব দেশে আছেন। তিনি ফিরে এলে পরে পরামর্শ করে তাঁদের মতামত জানাবেন। তার পর দীর্ঘ এক বছর পার হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো খবর পাওয়া গেল না। তাই চট্টগ্রাম থেকে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন আলেম হাটহাজারী গিয়ে মুহতামিম সাহেবের সাথে



www.icsbook.info

দেখা করেন। তিনি তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং বেশ উৎসাহের সাথে দেওবন্দ আন্দোলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বললেন, আমরা শিক্ষার ময়দানে কাজ করছি, আর জামায়াতে ইসলামী ঐ উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করছে। তিনি আমার চিঠির জবাব লিখবেন বলে তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলেন। কিন্তু মুহতামিমদ্বয়ের পক্ষ থেকে আর কোনো চিঠি আমার নিকট পৌঁছেনি।

## চরমোনাইর পীর সাহেবের জামায়াতবিরোধী অভিযান

১৯৯৫ সালেই পত্র-পত্রিকায় চরমোনাইর পীর সাহেবের বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা প্রকাশ পেতে শুরু করে। আমি এতে অত্যন্ত বিব্রতবোধ করি। কারণ, আমি তাঁকে মহব্বতের দীনী ভাই বলে মনে করতাম। কী কারণে তিনি এ ভূমিকা নিলেন, চিন্তা করে তার কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি নিজেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব।

প্রথমে ব্যারিস্টার কুরবান আলীকে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। একদিন পীর সাহেবের দলের নেতৃস্থানীয় দু'ব্যক্তি মেহেরবানী করে আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁরা হলেন জনাব আশরাফ আলী আকন ও হাফেজ মাওলানা হেমায়েতুদ্দীন। তাঁদেরকেও সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। আমি অত্যন্ত আবেগের সাথে বললাম, আমি পীর সাহেবের সাথে একান্তে মিলিত হতে চাই। আমাদের দু'জনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ যেন উপস্থিত না থাকেন। আমি আমার এ দীনী ভাইয়ের সাথে গোপনে কথা বলতে চাই, যাতে জামায়াতের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি সরাসরি জেনে নিতে পারি।

আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম যে, পীর সাহেবের সাথে আমার একান্তে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে আমি বলব, "আমার সাথে ব্যক্তিগত আলাপকালে আপনি জামায়াতের সমালোচনা করলে আমি তাতে আনন্দ প্রকাশ করেছিলাম। আমার সাথে ব্যক্তিপর্যায়ে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে আমার বিশ্বাস। তাই বারবার আপনি মেহেরবানী করে আমার বাড়িতে তাশরীফ এনেছিলেন। জামায়াত সম্পর্কে আপনার সুধারণা থাকার কারণেই আপনি জামায়াতের সাথে মিশে ইত্তেহাদুল উম্মাহতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। আপনি হাফেযজী হুযুরের সাথে আমার সাক্ষাতের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী ও খেলাফত আন্দোলনকে একমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এসব কিছু থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আপনি জামায়াতকে অপছন্দ করেন না। এখন আপনি জামায়াতের মধ্যে যেসব দোষ-ত্রুটি দেখতে পাচ্ছেন তা আমাকে ডেকে একান্তে বলতে পারতেন। মাঠে-ময়দানে বললে তো ইসলামী ঐক্যের কোনো প্রচেষ্টাই চলতে পারে না।"



www.icsbook.info

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের উপরিউক্ত তিন জন নেতা পীর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যাপারে চেষ্টা করেছিলেন কি না তা আমি জানতে পারিনি।

## কায়েদ সাহেব ও মুফতী সাঈদ আহমদের ঐক্যপ্রচেষ্টা

১৯৯৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠিতে শর্ষিনার 'কায়েদ সাহেব' নামে খ্যাত মাওলানা আযীযুর রহমানের উদ্যোগে তাঁরই মাদরাসায় ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি বৈঠক হয়। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হিসেবে ফুরফুরা শরীফের গদ্দীনশীন পীর মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সাহেব আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং ফুরফুরা দরবারের মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত বৈঠকে দেশের সর্বস্তরের ইসলামপন্থিদের ঐক্যপ্রচেষ্টা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটিতে মাওলানা আযীযুর রহমান, ড. মুস্তাফিজুর রহমান, চরমোনাইর পীর সাইয়েদ ফজলুল করীম এবং মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীও ছিলেন।

তাঁরা ঐক্যের মহান উদ্দেশ্যে ঐ দিন একটা চমৎকার নীতিকথা ব্যবহার করেছিলেন। আর তা হলো 'ইত্তিহাদ মাআল ইখতিলাফ' (মতপার্থক্যসহই ঐক্য)। তাঁরা খুবই বাস্তবভিত্তিক পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা সব রকমের মতপার্থক্য মিটিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য নয়, অথচ দীনের মহান স্বার্থে ঐক্য প্রয়োজন।

ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকের পর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে উক্ত কমিটির উদ্যোগে ইসলামী নেতৃবৃন্দের বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়। মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ ঐসব বৈঠকের আয়োজনে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালান। ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ঐ বৈঠকগুলো পরিচালনা করেন।

বৈঠকে বিভিন্ন সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন– বাইতুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবাইদুল হক, ঝালকাঠির মাওলানা আযীযুর রহমান, শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম, মাওলানা আবদুল জাব্বার (চট্টগ্রাম), মাওলানা আবদুস্ সুব্হান, মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী, অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক, মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।



www.icsbook.info

## এক বৈঠকে আমার যোগদান

১৯৯৭ সালের ১১ জুলাইয়ের বৈঠকে আমাকে দাওয়াত দিলে আমি উৎসাহ নিয়ে তাতে হাজির হই। ঝালকাঠির কায়েদ সাহেব, ফুরফুরার পীর সাহেব, বাইতুল মুকাররমের খতীব, শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমানসহ অনেকেই ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠকটি ঢাকার মীরপুরস্থ দারুস্ সালাম (ফুরফুরার দরবার শরীফ)-এ অনুষ্ঠিত হয়।

আমি ছাড়াও দাওয়াত পেয়ে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা সাঈদী সাহেব ঝালকাঠির বৈঠক থেকে শুরু করে পরবর্তী অনেক বৈঠকেই হাজির ছিলেন।

সেখানে সবাই লক্ষ্য করলেন যে, ইসলামী ঐক্যজোটের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব চরমোনাইর পীর সাহেব বৈঠকে হাজির হননি। অবশ্য তাঁর দলের সেক্রেটারি জেনারেল উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কিছু কথাবার্তার পর পরবর্তী বৈঠকের তারিখ ঠিক করা হয়। এর পরম্পরায় পরবর্তীতে আরো কয়েকটি বৈঠক হয়।

পীর সাহেব অনুপস্থিত থাকার কারণও জানা গেল। তিনি যেহেতু প্রকাশ্য ময়দানে বারবার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে 'জামায়াত' কোনো ইসলামী দলই নয়, তাই এর একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত জামায়াতের উপস্থিতিতে তিনি ঐ বৈঠকে আসতে পারছেন না।

## পীর সাহেবের একতরফা চ্যালেঞ্জ

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত পীর সাহেবের চ্যালেঞ্জটি নিম্নরূপ : তিনি জামায়াতকে বাহাস (বিতর্ক)-এর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর দলের একদল আলেম নিয়ে হাজির হবেন। জামায়াতও যেন তাদের একদল আলেম নিয়ে বাহাসে হাজির হয়। তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন যে, তিনি যদি প্রমাণ করতে না পারেন 'জামায়াত' কোনো ইসলামী দল নয়, তাহলে তিনি সদলবলে জামায়াতে যোগদান করবেন। আর যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে জামায়াতকে তাঁর দলে যোগদান করতে হবে।

জামায়াত এ জাতীয় বাহাসে কখনও শরীক হয় না। কারণ, এর দ্বারা কোনো মীমাংসা হয় না, ঝগড়া বৃদ্ধি পায় মাত্র। মুসলমানদের পতনযুগে এবং ইংরেজদের শাসনকালে মুসলমানদের বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে অনেক ইস্যুতেই বাহাস হতো। এমনকি কোনো ইংরেজ শাসনকর্তাকে বিচারক পদে বসিয়েও এ ধরনের বাহাস অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়।



www.icsbook.info

পীর সাহেব এমন চ্যালেঞ্জ দেওয়ার প্রয়োজন কেন বোধ করলেন তা আমার নিকট একটি রহস্য হয়েই রইল। আমার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পর্যায়ে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারতেন। তাতে মীমাংসা না হলে তিনি চ্যালেঞ্জ দিলে সেটা ছিল আলাদা কথা।

তাঁর দল খাঁটি ইসলামী দল হয়ে থাকলে জনগণ তাঁর দলেই শরীক হতে থাকবে। 'জামায়াত' ইসলামী দল কি না সে বিষয়ে দেশবাসী তাঁর কাছ থেকে মতামত চেয়েছে কি না, আমার জানা নেই। তিনি জামায়াতকে ইসলামী দল মনে করেন না বলে কি জামায়াতে জনগণ শরীক হচ্ছে না? হাজার হাজার আলেম জামায়াতে ইসলামীতে রয়েছেন। দেশবরেণ্য ও ব্যাপক জনপ্রিয় বেশ কয়েকজন আলেমও জামায়াতে ইসলামীতে মর্যাদার আসনে রয়েছেন। এ চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কী হতে পারে তা কি পীর সাহেব ভেবে দেখেছেন?

সঙ্গত কারণেই জামায়াত এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। তিনি জামায়াতের বিরুদ্ধে যত খুশি বলতে থাকুন। জামায়াতের নীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে চুপ থাকাই জামায়াত শ্রেয় মনে করে। তাঁর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে জামায়াত কোনো মন্তব্য করেনি এবং করবেও না। কোনো ইসলামী দল জামায়াতের বিরোধিতা করলে জামায়াত কোনো ইসলামী দলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে না। অতএব পীর সাহেবের এই বিরোধিতা ও চ্যালেঞ্জ একান্তই একতরফা।

**দারুস্ সালামের বৈঠকের পর–**

১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের যে বৈঠকে আমি উপস্থিত হওয়ার কারণে চরমোনাইর পীর সাহেব সেখানে হাজির হলেন না, সে বৈঠকে ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি ও মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমদ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, চরমোনাইর পীর ও জামায়াতের ব্যাপারটা মীমাংসা করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন।

জামায়াতের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে পীর সাহেব নিজেই সমস্যায় পড়লেন। ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত এপ্রিল মাসের বৈঠকে তিনি জামায়াতনেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে এক কমিটি বৈঠকে বসতে পারলেন অথচ ঢাকায় আমীরে জামায়াতের উপস্থিতির কারণে বৈঠকে হাজির হতেই পারলেন না।

কিছুদিন পর মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমদ আমাকে জানালেন, পরবর্তী এক বৈঠকে চরমোনাইর পীর সাহেবের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, তিনি ও ড. মুস্তাফিজুর রহমান আমার সাথে পীর সাহেবের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবেন। আমি অত্যন্ত খুশির সাথে এ উদ্যোগের জন্য তাঁকে মোবারকবাদ জানাই। কারণ, এ বিষয়টার একটা মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন, যাতে পীর সাহেব জামায়াতকে চ্যালেঞ্জ করায় তাঁর নিজের



www.icsbook.info

জন্য যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হয়ে যায়। এ চ্যালেঞ্জের কারণে তিনি জামায়াতের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় বৈঠকেও হাজির হতে পারছেন না।

## ড. মুস্তাফিজুর রহমানের চিঠি

১৯৯৭-এর ২৮ জুলাই তারিখে লেখা ড. মুস্তাফিজের চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ করলাম এবং আশান্বিত হলাম যে, আমার দীনী ভাই চরমোনাইর পীর সাহেবের সাথে আমার পুরনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনর্বহাল হয়ে যাবে। ড. মুস্তাফিজের চিঠি নিম্নরূপ–

মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব

আমীর ২৮/০৭/৯৭ ইং

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।

জনাব,

আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, 'আল ইত্তিহাদু মাআল ইখতিলাফ' একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর একটি বৈঠকে আপনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আপনি মোবারকবাদ জানিয়েছেন এবং এর কামিয়াবীও কামনা করেছেন। বিগত ১১.৭.৯৭ তারিখে দারুস সালাম ফুরফুরা পীর সাহেবের দরবারে এর একটি বৈঠকে জনাব মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হান ও এডভোকেট নজরুল ইসলামের উপস্থিতিতে চরমোনাইর পীর সাহেবের ঐক্যের ব্যাপারে একটি কথার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চরমোনাইর পীর সাহেব এবং আপনি আপনাদের সুবিধামতো সময় ও স্থানে একত্রে মিলিত হয়ে উভয়পক্ষের বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য ফায়সালায় উপনীত হবেন। কারণ চরমোনাইর পীর সাহেব জনসমক্ষে বলে ফেলেছেন যে, 'জামায়াতে ইসলামী খাঁটি ইসলামী দল নয়'। অতএব ঐক্যের খাতিরে এ ব্যাপারে মনখোলা আলোচনার প্রয়োজন। এ কথা থেকে তাঁকে ফিরে আসতে হলে যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিতে হবে। তাই আপনারা উভয়ে যদি একস্থানে বসে আলোচনা করেন, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় সুরাহা হয়ে যাবে এবং তা হবে মিল্লাতের জন্য অত্যন্ত কল্যাণবহ। এ ব্যাপারে আপনাদের উভয়ের সম্মতিসাপেক্ষে আমি ও মুফতী সাঈদ সাহেব আপনাদের আলোচনায় উপস্থিত থাকতে প্রস্তুত আছি। পরবর্তী কার্যক্রম আপনারা উভয়ে স্থির করবেন।

আমি ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় যথাসময়ে আপনাকে লিখতে ব্যর্থ হয়েছি। এজন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত। আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করার তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করুন।



www.icsbook.info

## ড. মুস্তাফিজকে লেখা জবাব

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

২৪/০৮/৯৭

ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার অন্যতম উদ্যোক্তা

প্রিয় ভাই,

ওয়া আলাইকুমুস্‌সলাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।

আশা করি আল্লাহর ফযলে ভালো আছেন। আপনার ২৮.৭.৯৭ তারিখের পত্রখানা যথাসময়ে আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রের জন্য অশেষ শুকরিয়া।

ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে মারাত্মক ষড়যন্ত্র চলছে এর প্রেক্ষিতে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টায় আপনার আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করে আপনার প্রস্তাব আমি সাদরে কবুল করা কর্তব্য মনে করছি।

জামায়াতে ইসলামী দৃঢ়ভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা পোষণ করে। এ বিষয়ে আমার লিখিত পুস্তকে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। তাছাড়া চরমোনাইর মুহতারাম পীর সাহেবসহ দেশের বরেণ্য ওলামা ও মাশায়েখের সাথে আমাদের একক ও যৌথভাবে একাধিক সাক্ষাৎ ও বৈঠক হয়েছে। ঐসব বৈঠক ও সাক্ষাতের মাধ্যমে আকাইদ সম্পর্কে আমাদের অবস্থানের বিষয়ে যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি অপনোদনের জন্য চেষ্টা করেছি।

সর্বশেষে বাংলাদেশের ২টি বৃহৎ ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় মুহতামিমদ্বয়ের সাথে সাক্ষাৎ ও পত্র-যোগাযোগ হয়েছে। এ যোগাযোগের মাধ্যমে (১) ইসমতে আম্বিয়া (২) আদালতে সাহাবা এবং আরও কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দলীয় অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এর অনুলিপি আপনার খিদমতে এ সঙ্গে প্রদান করা হলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর দ্বারা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশে ইসলামী শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হলে ইসলামী হুকুমত কায়েমের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ইসলামী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ, ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বশীলগণ এবং পীর-মাশায়েখ সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালে ইকামাতে দীনের পথে ইনশাআল্লাহ্‌ কোনো বাধাই টিকবে না।

এ প্রেক্ষিতে আপনার পক্ষ থেকে হযরত পীর সাহেব ও আমার মাঝে বৈঠকের প্রস্তাবের জন্য আপনাকে মুবারকবাদ জানাই। জনাব পীর সাহেব আমার



www.icsbook.info

গরীবখানায় বহুবার মেহেরবানী করে তাশরীফ এনেছেন– সে কথা আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তাঁকে আমি আপনার মাধ্যমে আন্তরিক মুহাব্বাতের সাথে আমার গরীবালয়ে তাশরীফ আনার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি। তাঁর সাথে ইসলামী ঐক্য সম্পর্কে মতবিনিময়ের এ সুযোগ পেলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।

আপনার চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় আমি দুঃখিত। আশা করি আপনি মনে কষ্ট নেবেন না। ইতি।

## ড. মুস্তাফিজুর রহমানের হতাশাব্যঞ্জক ফোন

কয়েকদিন পর ড. মুস্তাফিজুর রহমান ফোনে আমাকে জানালেন, আপনাকে যেমন চিঠি দিয়ে পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার দাওয়াত দিয়েছি, তেমনি পীর সাহেবকেও আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চিঠি দিয়েছি। চিঠি পেয়ে তিনি বেশ কয়েকজন আলেমসহ আমার বাসায় এলেন। তিনি বললেন, আমাকে একা অধ্যাপক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার দাওয়াত দিয়েছেন। আমার সাথের আলেমগণকে ছাড়া একা সাক্ষাৎ করতে পারব না। আমি বললাম, অধ্যাপক সাহেব তো একাই আসতে রাজি আছেন। আপনি কেন একা আসতে পারবেন না? আমি ও মুফতী সাঈদ সাহেব আপনাদেরকে সহায়তা করার জন্য হাজির থাকব। শেষ পর্যন্ত পীর সাহেব একা সাক্ষাৎ করতে সম্মত হলেন না।

আমি বললাম, পীর সাহেব বাহাস করতে চান বলেই একা আসতে সম্মত নন বলে মনে হয়। আপনারা একটা মীমাংসা করার উদ্যোগ নিলেন, কিন্তু একপক্ষের সহযোগিতার অভাবে তা সফল হলো না।

## মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদীর প্রচেষ্টা

ইসলামী কাফেলার আমীর প্রখ্যাত ওয়ায়েয মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদী, পীর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে আমার ধারণা, আপনি সফল হবেন না; হলে খুশি হব।

তিনি পীর সাহেবের সাথে এ বিষয়ে কথা বলার পর আমাকে জানালেন, পীর সাহেব বিদ্রূপ করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি আবার কবে থেকে জামায়াতে ইসলামীর দালালী শুরু করেছ?

পীর সাহেব এভাবে কথা বলায় যুক্তিবাদী সাহেব মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন বলে আমাকে জানালেন। হাফেয মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদী কোনো ফালতু লোক নন। অথচ তাঁর সাথে পীর সাহেব এভাবে কথা বলেছেন জেনে আমিও দুঃখ বোধ করেছি।



www.icsbook.info

দুঃখের বিষয় যে, ড. মুস্তাফিজুর রহমান ও মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদী উদ্যোগ নিয়েও পীর সাহেবকে আমার সাথে বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য রাজি করাতে সক্ষম হননি। মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদী সাহেব অত্যন্ত আবেগ নিয়ে ইসলামী ঐক্যের আশায় পীর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। ইসলামী ঐক্যের বৃহত্তর স্বার্থে আমি তাঁর সাথে বৈঠকের জন্য এখনও আগ্রহী।

## আরও কয়েকজনকে ঐক্যের উদ্দেশ্যে চিঠি

১৯৯৮ সালের ২৬ জানুয়ারি দুটো ইসলামী দলের সভাপতি ও মহাসচিবকে ঐক্যের উদ্দেশ্যে চিঠি দিলাম। তাঁরা হলেন–

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মান্নান, মুহতামিম গওহরডাঙ্গা মাদরাসা।
   সভাপতি, বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম জামায়াত।
২. মাওলানা আব্দুর রায্যাক
   মহাসচিব, বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম জামায়াত।
৩. মাওলানা কারী আহমদ উল্লাহ আশরাফ
   আমীরে শরীয়ত, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।
৪. মাওলানা জাফর উল্লাহ খান
   মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

প্রথম ব্যক্তি মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এর জামাতা। খাদেমুল ইসলাম জামায়াত মাওলানা ফরিদপুরীই কায়েম করেছিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি হাফেযজী হুযূরের বড় ছেলে। উপরিউক্ত চার জনকে লেখা চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ :

### মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে সুস্থ আছেন এবং তাঁর দেওয়া তাওফীক মোতাবেক দীনের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা আপনার যাবতীয় খিদমত কবুল করুন এবং আরও বেশি খিদমতের তাওফীক দান করুন।

আজ আপনার খিদমতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে কিছু কথা পেশ করার উদ্দেশ্যে লিখছি। আপনি নিশ্চয়ই বেদনার সাথে লক্ষ্য করছেন যে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ইসলামবিরোধী সকল শক্তি পরিকল্পিতভাবে দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্ট করে চলেছে, যার ফলে ইকামাতে দীনের ময়দান দ্রুত সংকীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।



www.icsbook.info

অথচ দেশে বিরাট ইসলামী শক্তি রয়েছে, যা ঐক্যবদ্ধ হলে ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়া সম্ভব বলে আমাদের ধারণা। ইসলামী ঐক্যের জন্য কী করা যায়, সে বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা জানার জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

সাত বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে নির্বাসন জীবন কাটানোর পর ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে দেশে ফিরে আসার পর ইসলামী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'ইসলামী ঐক্য : ইসলামী আন্দোলন' নামে একটি পুস্তিকার মাধ্যমে ঐক্যের একটি ফর্মুলা পেশ করি। তখন থেকে এ পর্যন্ত ইসলামী ঐক্যের জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তা 'ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা' নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকা দুটো এ সঙ্গে আপনার খিদমতে পাঠালাম।

১৯৯৫-এর শেষভাগে ও '৯৬-এর প্রথমাংশে ঐক্যের উদ্দেশ্যে হাটহাজারী ও পটিয়ার মুহতারাম মুহতামিমদ্বয়ের সাথে যেসব পত্রের আদান-প্রদান হয়েছে তার নকলও এ সঙ্গে দিলাম।

গত ৩১.১০.৯৭ তারিখে খুলনায় দক্ষিণ বঙ্গের ওলামা সম্মেলনে ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল এর নকলও এ সঙ্গে পাঠালাম। ইসলামী শক্তিসমূহের একটা ঐক্যমঞ্চ এ সময়ের তীব্র দাবি বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

## এসব চিঠি লেখার পটভূমি

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাওলানা মুফতী আবদুল কুদ্দুস ইসলামী ঐক্যের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে আমাকে জানালেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি চাকরি ও ব্যবসায়ে সময় না দিয়ে সর্বক্ষণ ওলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ করছেন বলেও জানালেন। তাঁর বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাটে। গওহরডাঙ্গা মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্রথমে খুলনা শহরে ও পরে ফরিদপুর শহরে, মাদাসায় হাদীসের উস্তাদ ছিলেন। খুলনায় তাঁর কিছু ব্যবসাও ছিল।

তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক, গওহরডাঙ্গার মুহতামীম শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতী আবদুল মান্নান ও খেলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে সকল ইসলামী দলের ঐক্যের প্রচেষ্টা চালান। তিনি জামায়াতে ইসলামীসহ সকলের ঐক্য প্রয়োজন বলে সবার সাথে আলোচনা করতে থাকেন।

১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পর তাঁরই পরামর্শে আমি উপরিউক্ত চার জনকে চিঠি লিখি। চার জনের মধ্যে একজনের সাথে এক দূতাবাসের



www.icsbook.info

রিসিপশন অনুষ্ঠানে দেখা হলে তিনি নিজের পক্ষ থেকে বললেন, আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। অবশ্য কেউ চিঠির জবাব দেননি। তবে মুফতী আবদুল কুদ্দুস সাহেব চিঠির প্রতিক্রিয়া ভালো বলেই জানালেন।

কাওমী মাদরাসার ওলামায়ে কেরামের মধ্যে গওহরডাঙ্গা মাদরাসার মুহতামিম শায়খুল হাদীস মুফতী মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের নেতৃস্থানীয় মর্যাদা থাকায় মুফতী আবদুল কুদ্দুস তাঁর সম্পর্কে বেশি আশান্বিত ছিলেন এ জন্য যে, তিনি উদ্যোগ নিলে হয়ত ইসলামী ঐক্য সম্ভব হবে। তিনি মুফতী আবদুল কুদ্দুস সাহেবের সরাসরি উস্তাদ। তিনি বেশ কিছু দিন অসুস্থ থাকার পর যখন ইন্তেকাল করলেন তখন মুফতী আবদুল কুদ্দুস হতাশ হয়ে গেলেন।

## ঝালকাঠির দ্বিতীয় সম্মেলন

ঝালকাঠি নেসারাবাদ সালেহিয়া আলিয়া মাদরাসা ময়দানে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখে সর্বদলীয় দ্বিতীয় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সম্মেলনের যে রিপোর্ট সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তা এখানে উদ্ধৃত করছি :

সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত ওলামা, মাশায়েখ, ইমাম, ইসলামপন্থি ও দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দসহ লাখো জনসমষ্টির মাঝে বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের আমীর জনাব আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব হুযূর) তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, দীন রক্ষার স্বার্থে আজ যেমন মুসলমানদের ঐক্যের প্রয়োজন, তেমনি দেশ ও জাতির স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক ভাইয়ের ঐক্যবদ্ধ হওয়াও প্রয়োজন। আট পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁর লিখিত এ ভাষণ পাঠ করে শোনান বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাওলানা রফিকুল্লাহ নেছারাবাদী।

তিনি তাঁর ভাষণে 'ইত্তেহাদ মাআল ইখতলাফ' (মতানৈক্যসহ ঐক্য)-এর নীতির আলোকে সকল শ্রেণীর মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীনের খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের নির্বাহী আমীর জনাব ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, হুযূরের ঐক্যের ডাকে সাড়া দিয়ে পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামা এবং আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত হয়েছেন। আমার জীবনে আমি কোনো মাহফিলে এমনটি দেখিনি।



www.icsbook.info

ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব মহান আল্লাহর দরবারে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দুআ করেন।

চরমোনাইর পীর সাহেব বলেন, এই মুহূর্তে ইসলামী হুকুমতের জন্য জামায়াত, ছারছীনা ও কাওমীসহ সকল পীর-মাশায়েখ ও আলেম-ওলামার একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলি পাঠ করেন, নেছারাবাদ ছালেহিয়া আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক জনাব আখতার ফারূক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আলী হায়দার মুর্শিদি, হযরত মাওলানা আরিফ বিল্লাহ (ছারছীনা), ঢাকা তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসার উপাধ্যক্ষ জনাব মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ, জনাব মাওলানা মুফতী সাইদ আহমদ, নওয়াপাড়া পীর সাহেবের প্রতিনিধি মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা আবু তালহা ও জনাব মাওলানা খন্দকার মাহবুবুল হক প্রমুখ।

এছাড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আলহাজ্জ আমির হোসেন আমু এবং বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক সংসদ সদস্য জনাব অধ্যক্ষ মোঃ আঃ রশিদও বক্তব্য প্রদান করেন।

এ সম্মেলনের সমাপনী ভাষণ প্রদান ও দুআ-মুনাজাত পরিচালনা করেন সম্মেলনের সভাপতি জনাব আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুর।

## সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলি

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে দীন ইসলাম আজ বিপন্ন। এ মুহূর্তে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো, স্বার্থকভাবে এ চক্রান্তের মোকাবিলা করা।

এ লক্ষ্যে সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে–

১. যাঁরা বিভিন্নভাবে ইসলামের খিদমত করে যাচ্ছেন, যেমন– দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, খানকাহ ও তা'লীমের মাধ্যমে, রাজনীতি ও সেবাকর্মের মাধ্যমে– তাঁরা এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবেন না কিংবা এমন কোনো বক্তব্য-অভিমত প্রকাশ করবেন না, যাতে নিজেদের মাঝে অনৈক্য, বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। এ সম্মেলন আরো প্রস্তাব করছে যে, তাঁরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে 'আল ইত্তেহাদ মাআল ইখতিলাফ' (মতানৈক্যসহ ঐক্য)-এর ভিত্তিতে নিজেদের মাঝে



www.icsbook.info

ইস্পাত-দৃঢ় ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে ইসলামবিরোধী চক্রের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। দেশী ও বিদেশী স্বার্থান্বেষীদের অভিলাষ চরিতার্থ করার প্রয়াসে দেশ ও জাতি আজ এক ক্রান্তিলগ্নে উপনীত। দেশের অর্থনীতি ও শিক্ষানীতি বিপর্যস্ত, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধ চরম আগ্রাসনের শিকার। এমতাবস্থায় প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি এ সম্মেলন উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে যে, দেশ ও জাতির স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে বাঁচান। ঈমান ও আকীদার ভিত্তিতে চিরায়ত, লালিত সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখুন।

## কতিপয় ইস্যুর উপর দস্তখত সংগ্রহ অভিযান

পরবর্তীতে জুন '৯৮-এর প্রথমদিকে মুহতারাম খতীব সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রণীত কতিপয় ইস্যুর উপর একটি খসড়ায় ওলামা, মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণের দস্তখত সংগ্রহের জন্য মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ ও ড. মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা যৌথভাবে দস্তখত সংগ্রহ অভিযান চালান। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেন। তাঁরা উল্লেখযোগ্য ইসলামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রায় সকলেরই স্বাক্ষর সংগ্রহে সক্ষম হন। তাঁরা মোট ৬৩ জনের দস্তখত সংগ্রহ করে ১৯৯৮ সালের ১৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রেসবিজ্ঞপ্তি পাঠান, যা ১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রেরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপ :

## দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী নেতৃবৃন্দের আবেদন

পরকালীন মুক্তি ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর দেওয়া ইসলামী শরীআত অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। কাওম ও মিল্লাতের এই ক্রান্তিকালে নিজেদের নাজাতের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের নিমিত্তে আসুন– আমরা যারা আল্লাহকে রব হিসেবে মানি, ইসলামকে একমাত্র সত্য দীন হিসেবে মানি এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিশ্বনবী ও শেষ নবী হিসেবে মানি আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে সঠিক আদর্শ হিসেবে মানি, তারা সকলে মিলে-মিশে কাজ করি এবং পারস্পরিক মতপার্থক্যগত অনৈক্যের ঊর্ধ্বে উঠে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্যপথে সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হই।

১. সমাজে বিরাজমান অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয় থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভের লক্ষ্যে কুফর, শিরক ও বিদআত এবং চরিত্র-বিধ্বংসী অশ্লীল ছায়াছবি, গান-বাজনা, উলঙ্গপনা, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, সন্ত্রাস ও চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ রোধ করার কার্যকর ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ করা যায় তা নিশ্চিত করা প্রতিটি দীনদার মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।



www.icsbook.info

২. নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা প্রতিটি মুসলমানের দীনী দায়িত্ব। সমাজে বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ইসলামী শরীআত পালন না করার কারণে এ ধরনের অমানবিক আচরণের প্রসার ঘটছে। ইসলামী পারিবারিক আইন ও পর্দাপ্রথা যথাযথভাবে যাতে চালু করা হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

৩. শিক্ষা একটি জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইসলাম শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। একটি দেশের জনগণের ঈমান-আকীদার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় জনগণের ঈমান-আকীদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। ব্রিটিশ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে বর্তমান সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতি শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ। শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার অর্থবহ প্রচলন অত্যাবশ্যক।

প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও গতিশীল, আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

৪. তাহযীব ও তমদ্দুন একটি জাতির প্রাণশক্তি। যখনই কোনো জাতি স্বীয় তাহযীব-তমদ্দুন থেকে দূরে সরে যায় কিংবা এর প্রতি অনীহা প্রকাশ করে তখন সে জাতি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুনপরিপন্থী মূর্তি ও প্রতিমা নির্মাণ করা হচ্ছে, অগ্নিকে সম্মান করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মসজিদ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, মাদরাসা জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আযানের প্রতি কটূক্তি করা হচ্ছে; যার ফলে কোনো কোনো দেশে মাইকে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, ইসলামবিরোধী এনজিওসমূহের ইসলামবিরোধী অপতৎপরতা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করছে। টেলিভিশন ও রেডিওতে ইসলামবিরোধী নাটক ও উপন্যাস প্রচারিত হচ্ছে, যা মুসলিম মিল্লাতের জন্য ধ্বংসের পথ অবধারিত করে দিচ্ছে। প্রতিটি দীনদরদি মুসলমানের পক্ষে এসবের প্রতিকারের জন্য সাধ্যানুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য কর্তব্য।

৫. কাদিয়ানীরা রাসূলে কারীম (স)-কে শেষ নবী বলে মানে না– অতএব তারা মুসলিম হতে পারে না। মুসলিম না হওয়ার কারণে তারা মুসলিম সমাজভুক্তও নয়। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা না থাকার কারণে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন !



www.icsbook.info

## আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীগণ

১. মাওলানা উবায়দুল হক– খতীব, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।

২. শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক

৩. মাওলানা আযীযুর রহমান কায়েদ সাহেব হুযূর

৪. মাওলানা আহমাদ শফি– মুহ্তামিম, দারুল উলুম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৫. মাওলানা আব্দুল মান্নান– মুহ্তামীম, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, ফরিদপুর।

৬. মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ হারুন– মুহ্তামীম, পটিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান– সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা।

৮. মাওলানা আমিনুল ইসলাম– খতীব, লালবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা।

৯. ড. মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান– অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. মাওলানা আহমাদুল্লাহ আশরাফ ইবনে হাফেযজী হুজুর, ঢাকা।

১১. মাওলানা ফজলুল হক আমিনী– মুহতামিম, লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়া, ঢাকা।

১২. মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আব্দুল কাহ্হার, ফুরফুরার পীর সাহেব।

১৩. মাওলানা কুতুবুদ্দীন– পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ।

১৪. মুফতী সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দেদী, ফুরফুরা দরবার, ঢাকা।

১৫. মাওলানা সুলতান যওক, দারুল মাআরিফ, চট্টগ্রাম।

১৬. মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ, প্রাক্তন এমএনএ।

১৭. মাওলানা আবদুস্ সুব্হান– প্রাক্তন এমপি।

১৮. মাওলানা সালাহ উদ্দীন– অধ্যক্ষ, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

১৯. মাওলানা মোহাম্মদ সালেহ– অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া মাদরাসা, খুলনা।

২০. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী– এমপি।

২১. মাওলানা হাফেজ খলিলুর রহমান– খতীব, কেন্দ্রীয় মসজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২২. মাওলানা আনোয়ার শাহ্ ইবনে মাওলানা আতাহার আলী– মুহতামিম, জামেয়া এমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।

২৩. মাওলানা নূরুল্লাহ– অধ্যক্ষ, হায়বত নগর আলিয়া মাদরাসা, কিশোরগঞ্জ।

২৪. মাওলানা রুহুল আমীন খান– নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব।

২৫. মাওলানা খলীলুর রহমান– অধ্যক্ষ, নেছারাবাদ আলিয়া মাদরাসা, ঝালকাঠি।

২৬. মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ– তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

২৭. মাওলানা এসএম আবু নোমান– অধ্যক্ষ, দারুল উলুম, চট্টগ্রাম।

২৮. ড. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ– অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।



www.icsbook.info

২৯. মাওলানা আবদুল লতিফ– সেক্রেটারি জেনারেল, জমিয়াতুল মোদার্রেসীন বাংলাদেশ।

৩০. মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার হোসেন তাহের জাবেরী– খতীব, শাহী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।

৩১. মাওলানা রফিক আহমদ– খতীব, হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ, চাঁদপুর।

৩২. মাওলানা আব্দুর রব কাফী– অধ্যক্ষ, হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা।

৩৩. মাওলানা কারী উবায়দুল্লাহ– খতীব, চকবাজার জামে মসজিদ, ঢাকা।

৩৪. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ– সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন।

৩৫. মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী– অধ্যক্ষ, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী।

৩৬. মাওলানা অধ্যাপক আখতার ফারূক।

৩৭. মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক– মুহাদ্দিস, পটিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৩৮. মাওলানা আতাউর রহমান, কিশোরগঞ্জ।

৩৯. মাওলানা আ ফ ম আবু বকর সিদ্দিক– প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪০. মাওলানা ড. আ. র. ম. আলী হায়দার– চেয়ারম্যান, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪১. মাওলানা মুখলিছুর রহমান– পেশ ইমাম, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।

৪২. মাওলানা মাহবুবুল হক– প্রাক্তন হেড মাওলানা, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

৪৩. মাওলানা মোফাজ্জল হোসাইন খান– ডাইরেক্টর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৪৪. মাওলানা ইয়াহইয়ার রহমান– ডীন, ধর্মতত্ত্ব অনুষদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪৫. মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম– মাখজানুল উলুম, খিলগাঁও, ঢাকা।

৪৬. মাওলানা নেছারুল হক– শায়খুল হাদীস, দারুল উলুম, চট্টগ্রাম।

৪৭. মাওলানা আহসান সাইয়েদ– অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৮. মাওলানা আহমাদুল হক– খতীব, বায়তুশ শরফ।

৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান, আল-জামেয়াতুস সিদ্দীকিয়া, দারুস সালাম।

৫০. মাওলানা আমিনুল হক– মুহাদ্দিস, দারুস সালাম।

৫১. মাওলানা আবদুল কাইউম– মুহতামীম।

৫২. মাওলানা শফীকুর রহমান– মুহাদ্দিস, জামেয়া এমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।

৫৩. মাওলানা নূরুস সালাম– পীর সাহেব, সুফিয়া নূরিয়া, চট্টগ্রাম।

৫৪. মাওলানা শামসুল হক– পীর সাহেব, ছোট কুমিরা, চট্টগ্রাম।



www.icsbook.info

৫৫. মাওলানা অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার।
৫৬. মাওলানা আকরাম হোসেন– মুহাদ্দিস, নওগাঁ আলিয়া মাদরাসা, নওগাঁ।
৫৭. মাওলানা মোঃ সোলায়মান– অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৫৮. মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম।
৫৯. মাওলানা এডভোকেট নজরুল ইসলাম, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।
৬০. মাওলানা যাইনুল আবেদীন– অধ্যক্ষ, তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা, ঢাকা।
৬১. মাওলানা সিরাজুল ইসলাম– অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই মিসবাহুল উলুম, ঢাকা।
৬২. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
৬৩. মাওলানা আব্দুল জব্বার– প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ ইমাম সমিতি।

## ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে বাইতুল মুকাররমের খতীব সাহেবের প্রচেষ্টা

ইসলামী ঐক্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে যারা সকল ইসলামী দল ও মহলকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের মধ্যে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবাইদুল হক সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নেতৃস্থানীয় ওলামা, মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দকে একমঞ্চে সমবেত করার সাধ্যমতো চেষ্টা করে এসেছেন।

১৯৯৮ জুন মাসে মুহতারাম খতীব সাহেবের সভাপতিত্বে ঐক্যপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, সকল দীনী মহলকে ইসলামের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য এমন ইস্যু বাছাই করতে হবে, যে বিষয়ে মতভেদের কোনো অবকাশ নেই। এ নীতির ভিত্তিতে উক্ত বৈঠকে একটা খসড়া তৈরি করা হয় এবং বৈঠকে উপস্থিত সবাই তাতে দস্তখত করেন।

উক্ত বৈঠকে খতীব সাহেব দুটো বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন :

১. ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে সকল পার্থক্য সত্ত্বেও সর্বসম্মত বিষয়ে একমঞ্চে সমবেত হওয়া কর্তব্য। ১৯৫১ সালে করাচিতে ৩১ জন নেতৃস্থানীয় আলেম একমত হয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। ঐ ৩১ জনের মধ্য থেকে কোনো মহলই বাদ পড়েনি। শিয়া, আহলে হাদীস, ব্রেলভী, দেওবন্দী এবং জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দের ঐক্য দ্বারা এই 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, দীন ইসলামের প্রয়োজনে এভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐ সময় যাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন আজ তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আরও বেশি প্রয়োজন। তাই ঐক্য না হাওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

২. ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে ক্ষমতার মূল নেতৃত্ব কোনো মহিলার হাতে থাকা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু স্বৈরশাসকদের অপসারণের উদ্দেশ্যে বিকল্প পুরুষ নেতৃত্ব পাওয়া না গেলে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে কোনো মহিলার নেতৃত্ব অপরিহার্য



www.icsbook.info

হয়ে পড়লে সাময়িকভাবে তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে ১৯৬৫ সালে সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) যখন মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে চাইল, তখন মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুহাম্মদ শফী, মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী (র), মাওলানা আতাহার আলী (র), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-সহ অনেক আলেম তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন।

ইসলামী পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপকারী হিসেবে আইয়ুব খান আলেম সমাজের নিকট ইসলামবিরোধী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। ইংরেজ শাসকরা সকল ইসলামী আইনের বদলে রোমান ল' চালু করলেও তারা ইসলামের পারিবারিক আইনে হাত দেয়নি। আইয়ুব খানই প্রথম এ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিলেন।

সুতরাং যালিম ও ইসলামবিরোধী সরকার থেকে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে কোনো পুরুষ-নেতৃত্বের পক্ষে সর্বদলীয় ঐক্যের অভাবে নারী-নেতৃত্ব সমর্থনের পক্ষে ঐকমত্যের উদাহরণ রয়েছে।

(জামায়াতে ইসলামী COP-এর অন্তর্ভুক্ত থাকায় প্রেসিডেন্ট পদে মহিলা প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য মুফতী শফী সাহেবের করাচিস্থ বাসভবনে ৫ সদস্যের যে ডেলিগেশন পাঠিয়েছিল, আমি তাদের একজন ছিলাম। মুফতী সাহেব সম্মতি দেওয়ার পর জামায়াতও তাদের বৈঠকে এ বিষয়ে একমত হয়।)

গত সেপ্টেম্বরে (১৯৯৮) দেশের কলঙ্ক তাসলীমা নামের এক নষ্টা ও ভ্রষ্টা মুরতাদ পলাতক মহিলার গোপনে দেশে ফিরে আসার পর যত দল ও সংগঠন তার শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল সেগুলোর নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে খতীব সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইসলামবিরোধী সকল কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি সকলকে সম্মিলিতভাবে গণসমাবেশ ও আন্দোলন করার জন্য সম্মত করান এবং এ সিদ্ধান্তের পক্ষে তাঁদের দস্তখতও সংগ্রহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বৈঠকে সম্মতি দেওয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ কোনো মহল তা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কারণে ঐ ঐক্যপ্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

## ঐক্যপ্রচেষ্টার নতুন উদ্যোগ

ইত্তেহাদুল উম্মাহ নামের ঐক্যমঞ্চটি ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৮৯ সালের এপ্রিলে সর্বদলীয় শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে ঐক্যের প্রচেষ্টাও সফল হলো না। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে হাফেযজী হুযূরের সাথে আমার সাক্ষাতেও এর কোনো ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখা গেল না। ১৯৯৫ সালে হাটহাজারী ও পটিয়া মাদরাসার মুহতামিমদ্বয়ের নিকট চিঠির আদান-প্রদানের পরও তাতে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। এরপর ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণ করা আমার আর হিম্মতে কুলায়নি।


www.icsbook.info

নৈরাশ্যের ঐ অন্ধকারে ১৯৯৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠি থেকে ঐক্যের এক প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার খবর পেলাম। এরই ধারাবাহিকতায় ঐ বছর ১১ জুলাই মীরপুরস্থ ফুরফুরা দরবার শরীফ, দারুস সালামের বৈঠকে সকল মহলের (চরমোনাইর পীর সাহেব ছাড়া) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি দেখে আমার মনে ঐক্যের ব্যাপারে পুনরায় আশার সঞ্চার হলো।

১৯৯৮ সালের ১৮ নভেম্বর সারাদেশের ৬৩ জন নেতৃস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখের যুক্ত-বিবৃতি জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হওয়ার পর ঐক্যের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল মনে হলো।

ঐ বছর ১৫ ডিসেম্বর ফুরফুরা দরবার– মারকাযে ইশাআতে ইসলাম দারুস সালাম, মীরপুরে উক্ত স্বাক্ষরকারীগণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ মাওলানা আযীযুর রহমান কায়েদ সাহেবের সভাপতিত্বে 'জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

## জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক কমিটি

১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সম্মেলনেই জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবকে প্রধান আহ্বায়ক করে নিম্নলিখিত ওলামা-মাশায়েখকে নিয়ে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়।

১. মাওলানা উবায়দুল হক (খতীব, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ)।

২. শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক।

৩. মাওলানা আহমাদ শফী' (মুহতামিম, হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম)।

৪. মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব)।

৫. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৬. মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।

৭. মাওলানা আবদুল মান্নান (শায়খুল হাদীস, গাওহারডাঙ্গা)।

৮. মাওলানা আবদুস্ সুব্হান।

৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সম্পাদক, মাসিক মদীনা)।

১০. মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী (মুহতামিম, জামেয়ায়ে ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম)।

১১. মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী, (প্রিন্সিপ্যাল, জামেয়া কুরআনিয়া, লালবাগ)।

১২. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, এমপি।

১৩. মাওলানা শাহ মুহিব্বুল্লাহ্ (ছারছীনা)।

১৪. মাওলানা আনোয়ার হোসাইন তাহের আল জাবেরী (খতীব, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম)।



www.icsbook.info

১৫. মাওলানা কুতুবুদ্দিন (পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ)।

১৬. মাওলানা সাইয়্যেদ নজর ইমাম মুহাম্মদ (পীর সাহেব, নারিন্দা)।

১৭. মাওলানা আব্দুল লতিফ (পীর সাহেব, ফুলতলী, সিলেট)।

১৮. মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন আহমদ আবু বকর মিয়া (পীর সাহেব, বাহাদুরপুর)।

তাছাড়া মুফতী সাঈদ আহমদ সাহেবকে প্রধান করে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়।

### লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যবৃন্দ

১. মুফতী সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদী (প্রধান, লিয়াজোঁ কমিটি)।

২. মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল সাইয়্যেদ কামাল উদ্দীন জাফরী।

৩. ড. আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর।

৪. অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক।

৫. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

৬. মাওলানা আব্দুল মতিন।

৭. মাওলানা আতাউর রহমান খান (সাবেক এমপি)।

৮. মাওলানা কবি রুহুল আমিন খান (নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব)।

৯. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

### নতুন ঐক্যপ্রচেষ্টায় ফুরফুরার পীর সাহেবের অব্যাহত অবদান

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ফুরফুরার পীর মুহতারাম মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দীকী উপস্থিত ছিলেন। ঐ বছর ১১ জুলাই সর্বদলীয় যে বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম, তা মীরপুরস্থ ফুরফুরার দরবার শরীফেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত ঐ দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেই গৃহীত হয়।

প্রতি বছরই মীরপুরস্থ মারকাযে ইশায়াতে ইসলাম দারুস সালামে ফুরফুরা শরীফের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন ৩ থেকে ৫ দিনব্যাপী চলে। এ সম্মেলনের সময়ই পীর সাহেব সেখানে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন করার সুযোগ করে দেন। পীর সাহেবের সম্মেলনের জন্য তৈরি মঞ্চ ও প্যান্ডেলই শরীয়াহ্ কাউন্সিল ব্যবহার করে। আপ্যায়নের সকল ব্যয়ভার পীর সাহেবই বহন করেন। শরীয়াহ্ কাউন্সিলের এমন আর্থিক সঙ্গতি এখনও হয়নি যে, তারা প্রতি বছর সম্মেলনের আয়োজন করতে পারবেন। এ দিক দিয়ে ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে পীর সাহেবের অবদান অব্যাহতভাবে চলছে।



www.icsbook.info

ইসলামের জন্য এ পীর বংশের বিরাট ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যখন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামীম ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতা মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র) পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে মি. গান্ধি ও মি. নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন তখন ফুরফুরার ঐ সময়কার পীর সাহেব মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (র) ১৯৪৩ সালে কলকাতায় গোটা ভারতবর্ষের ওলামায়ে কেরামের এক সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং ঐ সম্মেলনেই পাকিস্তান দাবির পক্ষে 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' পার্টি গঠিত হয়।

## জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ২০০৩ সালের বার্ষিক সম্মেলন

২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ফুরফুরার পীর সাহেবের মীরপুরস্থ দারুস সালামে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলনে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। ঐ রিপোর্টে ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে ক্রমে ক্রমে কিভাবে এবং কখন জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয় এর পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। ঐ রিপোর্ট থেকে প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১৬.১০.২০০০ তারিখ জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বৈঠক মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে ৫৫ বি, পুরানা পল্টনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলকে একটি স্থায়ী কমিটিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত এবং সেই সাথে নিম্নের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়–

১. পূর্বঘোষিত জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক ও লিয়াজোঁ কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যকে মূল কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২. সভায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের প্রস্তাবক্রমে মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবকে স্থায়ীভাবে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সভাপতি মনোনীত করা হয়।

৩. সভায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে সহ-সভাপতি, মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমাদ মোজাদ্দেদী সাহেবকে মহাসচিব ও মাওলানা হারুনুর রশিদ খানকে যুগ্ম-মহাসচিব মনোনীত করা হয় এবং নিম্নলিখিত শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের কমিটি গঠিত হয়।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষকগণ–

শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক।

হযরত মাওলানা আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী (পীর সাহেব, ফুরফুরা)।

হযরত মাওলানা আহমদ শফী (মুহতামিম, হাটহাজারী)।



www.icsbook.info

হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান (কায়েদ সাহেব)।

হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল মান্নান (শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম, গাওহারডাঙ্গা মাদরাসা)।

সভায় মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

১০.০৭.২০০১ তারিখ পুরানা পল্টনে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি মজলিসে আমেলা (কর্ম-পরিষদ) গঠিত হয়।

**মজলিসে আমেলার সদস্যগণ**

মাওলানা উবায়দুল হক।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

মুফতী সাইদ আহমদ।

মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।

মাওলানা আবদুস্ সুব্হান।

মাওলানা ফজলুর রহমান।

মাওলানা যাইনুল আবেদীন।

মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন আহমদ আবু বকর মিয়া।

এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

০৯.০৮.২০০১ তারিখ শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বৈঠক মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রেডিও-টিভিতে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করা, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, ভাস্কর্যের নামে মূর্তি নির্মাণ বন্ধ করা ও যে সকল আলেম এখনও জেলে রয়েছেন তাঁদেরকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০.০৯.২০০২ তারিখ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল, বাংলাদেশের উদ্যোগে একটি জাতীয়ভিত্তিক ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং এজন্য মুফতী সাঈদ আহমদ, মাওলানা যাইনুল আবেদীন, মুফতী আব্দুল কুদ্দুস ও মাওলানা আব্দুল লতিফ নিযামীর সমন্বয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

০৩.১১.২০০২ তারিখ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জাতীয় সম্মেলনের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা



www.icsbook.info

হয় এবং খতীব সাহেবের বিশেষ দাওয়াতনামা নিয়ে ওলামা-মাশায়েখের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খতীব সাহেব ও মুফতী সাঈদ সাহেবের স্বাক্ষরিত চিঠি নিয়ে ওলামা-মাশায়েখের সাথে বিশেষভাবে যোগাযোগ করা হয়।

০১.০১.২০০৩ তারিখ বুধবার সকাল ১০টায় মারকাযে ইশায়াতে ইসলাম, ২/২ দারুস সালামে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল বাংলাদেশের জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা উবায়দুল হক। সম্মেলনে দেশবরেণ্য ৬৭ জন ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সম্মানিত চেয়ারম্যান মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হক। বিগত বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন সেক্রেটারি জেনারেল মুফতী সাঈদ আহমদ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মাওলানা আবদুস্ সুব্হান এমপি। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন সহসভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। সম্মেলনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সারা বিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের সকল সমস্যার সমাধান ও কল্যাণের জন্য ওলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উক্ত জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন :

১. হযরত মাওলানা উবায়দুল হক।

২. শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক।

৩. হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

৪. মুফতী সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদী।

৫. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল সাইয়্যেদ কামাল উদ্দিন জাফরী।

৬. হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি।

৭. হযরত মাওলানা আবদুস সুব্হান এমপি।

৮. হযরত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

৯. হযরত মাওলানা সুলতান জাওক নদভী (চট্টগ্রাম)।

১০. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল যাইনুল আবেদীন।

১১. হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ নিযামী।

১২. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

১৩. হযরত মাওলানা এ. কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ।

১৪. হযরত মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ।

১৫. হযরত মাওলানা ইসহাক।

১৬. হযরত মাওলানা জুলফিকার আহমাদ কিসমতী।



www.icsbook.info

১৭. হযরত মাওলানা ইমদাদুল হক আড়াইহাজারী।
১৮. হযরত মাওলানা ড. আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর।
১৯. হযরত মাওলানা ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান।
২০. হযরত মাওলানা আশিকুর রহমান কাশেমী।
২১. হযরত মাওলানা আব্দুর রহিম ইসলামাবাদী (ঢাকা)।
২২. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল শাহজাহান (ঢাকা)।
২৩. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল ইলিয়াছ (চট্টগ্রাম)।
২৪. হযরত মাওলানা কে. এম. আব্দুস সুবহান।
২৫. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল ইউনুছ (ঢাকা)।
২৬. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল মফিজুর রহমান (রাঙ্গামাটি)।
২৭. হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান (সাবেক এমপি)।
২৮. হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম।
২৯. হযরত মাওলানা আব্দুল হাই মেশকাত।
৩০. হযরত মাওলানা অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।
৩১. হযরত মাওলানা সালেম ওয়াহিদী।
৩২. হযরত মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম (মুহতামীম)।
৩৩. . হযরত মাওলানা আতাউর রহমান এমপি।
৩৪. হযরত মাওলানা মোঃ সালমান (মুহতামীম)।
৩৫. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল এইচ. এম. শহীদুল ইসলাম (রাজশাহী)।
৩৬. হযরত মাওলানা আবুল কালাম (মুহতামীম, ঢাকা)।
৩৭. হযরত মাওলানা আবদুস সাত্তার (ফেনী)।
৩৮. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ (খুলনা)।
৩৯. হযরত মাওলানা ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মুহাম্মদ ইসমাঈল (নোয়াখালী)।
৪০. হযরত মাওলানা এ. টি. এম. আব্দুল হাই আল মাদানী।
৪১. হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান।
৪২. হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ।
৪৩. হযরত মাওলানা আবদুস সালাম কাশেমী (সাতক্ষীরা)।
৪৪. হযরত মাওলানা ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মুঃ কুতুব উদ্দীন।
৪৫. হযরত মাওলানা মনিরুল আহসান মাদানী (যশোর)।
৪৬. হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল কুদ্দুছ।
৪৭. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (ঢাকা)।
৪৮. হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান (ঢাকা)।



www.icsbook.info

৪৯. হযরত মাওলানা আব্দুস সালাম (ঢাকা)।

৫০. হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান (ঢাকা) প্রমুখ।

সম্মেলনের খবর জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

## জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পরবর্তী সম্মেলন

২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন ২০০৪, মারকাযে ইশায়াতে ইসলাম, দারুসসালাম (ফুরফুরা দরবার শরীফ) মিরপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা উবায়দুল হক– খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের প্রধান উপদেষ্টা শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক। তিনি কুরআন-হাদীসের উপর সকল মুসলমান– বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামকে অটল থাকার আহ্বান জানান।

বিশেষ মেহমান হিসেবে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুসলমানদেরকে তাদের দুশমন সম্পর্কে জানতে হবে এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তিনি আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

ড. মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন মতভেদ পরিত্যাগ করে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান বলেন, ওলামায়ে কেরামকে সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতী সাঈদ আহমদ সকল ওলামায়ে কেরামকে একত্রে বসে সব বিষয়ের সকল সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানান।

হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি শিরক-বিদআত বাদ দিয়ে সকল মতের ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। মাওলানা আশিকুর রহমান কাশেমী বলেন, দেশের জনগণ জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের নিকট থেকে মতপার্থক্যের শরীয়াভিত্তিক সমাধান প্রত্যাশা করে। তাই শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আরো বিস্তৃতি ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশ জমীয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম মোঃ শামছুল আলম বলেন, সকল স্তরের ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের এ সম্মেলন ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করবে। জনাব মতিউর রহমান (এমপি) ওলামায়ে কেরামের ঐক্যের আহ্বান জানান। মাওলানা ইমদাদুল



www.icsbook.info

হক আড়াইহাজারী জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের মাধ্যমে সকল মতের ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে আরো আলোচনা করেন প্রফেসর মাওলানা নূর মোহাম্মাদ, মাওলানা এ কিউ এম ছিফাতুল্লাহ, মাওলানা এডভোকেট নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ড. হাসান মঈন উদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, মাওলানা রফিক আহমদ ও ড. আমিনুল হক।

সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস, মাওলানা সরদার আব্দুস সালাম, ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম, মাওলানা আ ন ম আব্দুর রশীদ, মাওলানা রশিদ ফেরদাউস, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, মাওলানা রহমাতুল্লাহ, মাওলানা শহীদুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসীম ও মাওলানা নিজাম উদ্দীন।

সভাপতি হযরত মাওলানা উবায়দুল হক জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের মাধ্যমে খুঁটিনাটি সকল মতভেদ ভুলে ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান এবং সকল মতপার্থক্য জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের মাধ্যমেই সমাধান করার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। শাহতলীর (কুমিল্লা) পীর হযরত মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের মুনাজাতের মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়।

### জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলই সর্বদলীয় একমাত্র ঐক্যমঞ্চ

বাংলাদেশে ইসলামী শক্তিসমূহের ঐক্যের একমাত্র প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলই উল্লেখযোগ্য। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হকের নেতৃত্বে এবং ফুরফুরা শরীফের গদ্দীনশীন পীর মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দীকীর পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংগঠনটি উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে আরও বেশ কিছু মহল বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে আছে। আশা করি জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল তাদেরকেও এ সংগঠনভুক্ত করার প্রয়াস চালাবেন, যাতে ইসলামী ঐক্য পূর্ণতা লাভ করে। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তিনি সকল মহলকে ঐক্যবদ্ধ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। কোনো মহলকেই তিনি ঐক্যের বাইরে দেখতে চান না। কারণ, কোনো মহল বাইরে থাকলে এই ঐক্য পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

যারা এমন মনোভাব পোষণ করেন যে, অমুক দলকে বাদ দিতে হবে বা অমুক দলের সাথে ঐক্য করব না, তারা সার্বিক ঐক্যই চান না।



www.icsbook.info

মতবিরোধ চিরকালই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মতপার্থক্য আছে বলেই তো আমরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের নীতি হচ্ছে 'ইত্তেহাদ মাআল ইখতিলাফ'। মতভেদের জায়গায় মতভেদ থাকুক। ভিন্ন ভিন্ন দল ও সংগঠন বহাল থাকুক। কিন্তু দীনের দুশমনদের মোকাবিলা ও দীনের বিজয়ের প্রয়োজনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কারণ, কোনো দল বা মহলই একা এ বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নয়। আর এ দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ তাআলার দরবারে সবাইকেই কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে।

এটাই জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের দাওয়াত। এটাই ঐক্যের দর্শন। এটাই ঐক্যের ভিত্তি।

আল্লাহ না করুন, এমন কিছু ব্যক্তিত্বও যদি থাকেন, যারা নেতৃত্বের প্রতি এতটা লোভী যে, অন্য কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলে শরীক হতে সম্মত হতে পারছেন না, তাহলে তারা জনগণের নিকট চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। তাদের ছাড়াই এ কাউন্সিল ইসলামী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাবে বলে আশা করা যায়। কারণ, জনগণ ঐক্যের জন্য পাগল।

## ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যোগাযোগ-প্রচেষ্টা

শেখ হাসিনার দুঃশাসনে দেশের সকল মহলবিশেষ করে ইসলামী মহলে চরম অস্থিরতা দেখা দেয়। ফলে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগবিরোধী সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়। জামায়াত সিদ্ধান্ত নিল যে, ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে এ ব্যাপারে প্রথম যোগাযোগ করা দরকার। আর এ জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটকে প্রথমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে বিএনপির সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

জামায়াত ১৯৯৭ সালের শুরুতেই চিন্তা করল যে, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলামী ইস্যুগুলোর তালিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ইসলামী ঐক্যজোটকেও এই তালিকা রচনার পরামর্শ দিতে হবে। এরপর উভয় তালিকা সামনে রেখে জামায়াত ও ঐক্যজোট একটা সমন্বিত তালিকা তৈরি করবে। একমঞ্চ থেকে সমন্বিত তালিকা প্রচার করা সম্ভব না হলে যুগপৎ পদ্ধতিতে প্রচার করা হলেও ইসলামী ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সাথে সাথে জনগণের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হবে।

১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসেই জামায়াত ১৭ দফার তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করে; কিন্তু ঐক্যজোটের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় ১৯৯৭ সালের ১৩ মে তারিখে দেশবাসীর বিবেচনার জন্য 'জামায়াতে ইসলামীর ১৭ দফা' শিরোনামে চার পৃষ্ঠার একটি বড় হ্যান্ডবিল প্রকাশ করা হয়।



www.icsbook.info

সারা দেশে জামায়াত ছোট-বড় সমাবেশ করে এই ১৭ দফা প্রচার করে। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে ছোট আকারে ১৭ দফার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশ করা হয় এবং তা সকল ইসলামী মহলে পৌছানোর প্রচেষ্টাও চালানো হয়।

## বিএনপির সাথে যোগাযোগের সূচনা

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে বিএনপি নেতা জনাব মোরশেদ খান [বর্তমান (২০০৬) পররাষ্ট্রমন্ত্রী]-এর সাথে বিমানে পাশাপাশি বসায় অনেক আলাপ হলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কি কোনো পরিকল্পনা আপনাদের আছে, নাকি এখনকার মতো বিরোধী দলে থেকেই সন্তুষ্ট থাকবেন? তিনি বললেন, বলেন কি? জিততে না পারলে দলকে টিকিয়ে রাখাই কঠিন হবে। বললাম, গত নির্বাচনের মতো একলাই নির্বাচন করবেন, না জোট বাঁধার চিন্তা আছে? বললেন, ঢাকা ফিরে গিয়ে আপনার সাথে দেখা করব। বললাম, আপনি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে যোগাযোগ করুন। বললেন, আরে! তিনি তো আমার বন্ধু মানুষ। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়েরই ছাত্র ছিলাম।

তিনি কয়েক দিন পরই মাওলানা নিজামীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। যোগাযোগের সূচনা হয়ে গেল।

আমি তীব্রভাবে অনুভব করলাম, বিএনপির সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির পূর্বে ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। কর্মপরিষদে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলাম। জামায়াতের ১৭ দফা প্রচারের আগে যোগাযোগ করার সুযোগ পাওয়া গেল না। কেমন করে এ সুযোগ করা যায়– কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মীর কাসেম আলী সে দায়িত্ব নিলেন। বললেন, ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হকের সাথে তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা আছে। পারিবারিক পর্যায়ে আসা-যাওয়াও আছে। এ কথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। অবিলম্বে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য মীর সাহেবকে আমি বারবার তাগিদ দিতে থাকলাম।

## শায়খুল হাদীসের সাথে প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ

১৯৯৮ সালের মে মাসের কোনো এক দিন জনাব মীর কাসেম আলীর মীরপুরস্থ বাড়িতে গেলাম। এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলামও সেখানে হাজির ছিলেন। জানতে পারলাম, তিনি অতি গোপনে ও সতর্কতার সাথে এসেছেন। নিজের গাড়িতে আসেননি, যাতে তাঁর ড্রাইভার ওখানে আসার খবর জানতে না পারে। বাড়িতেও কাউকে জানাননি যে, তিনি ওখানে আসবেন। মীর কাসেমের ছেলে সালমান গাড়ি চালিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছে।



www.icsbook.info

যাহোক, ওখানে শায়খুল হাদীসের সাথে আমার একান্তে আলাপ শুরু হলো। ঐ পক্ষে তিনি একা, আর এ পক্ষে আমরা দু'জন। কথা শুরু করলাম, "শেখ হাসিনার শাসনামলে যা কিছু হচ্ছে তাতে আওয়ামী লীগবিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে আমরা যোগাযোগও শুরু করেছি। আমরা মনে করি, ইসলামী ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে প্রথম ঐক্য হওয়া প্রয়োজন, যাতে আমরা একসাথে একসুরে বিএনপির সাথে দরকষাকষি করতে পারি। রাজনৈতিক ঐক্যের স্বার্থে এবং আন্দোলনের প্রয়োজনেই দাবি-দাওয়ার দফা-ওয়ারী তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। সে তালিকায় ইসলামী ইস্যুগুলো আমরা একসাথে পেশ করলে দাবির তালিকায় তা অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হবে। তাই আমাদের মধ্যে প্রথমে ঐক্য হওয়া প্রয়োজন।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বললেন, বিষয়টা অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। আমরা কয়েক দল মিলে ঐক্যজোট করেছি। এ ব্যাপারে জোটের শরীক দলের মতামত যোগাড় করার আগে আমি কোনো মতামত দিতে পারছি না।

তাঁর এ বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করে বললাম, আমাদের মধ্যে ঐক্য অবশ্যই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; কিন্তু আমরা কি এমন একটা কাজ করতে পারি না, যা ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং জনগণও তাতে উৎসাহবোধ করবে?

**যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব**

আমি বললাম, রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনে একমঞ্চে না গিয়েও একই কর্মসূচির ভিত্তিতে যুগপৎ আন্দোলন করা যেতে পারে। আমরা কেয়ারকেটার সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সাথে বিগত সরকারের আমলে যুগপৎ আন্দোলন করেছি। ইসলামবিরোধী দলের সাথেও যদি কোনো রাজনৈতিক ইস্যুতে যুগপৎ আন্দোলন করা যায়, তাহলে আমরা ইসলামী দলগুলো ইসলামী ইস্যুতে কি যুগপৎ আন্দোলন করতে পারি না? ইসলামী ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামী যদি কতক ইসলামী ইস্যু নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন করে তাহলে কেমন হয়?

তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বললেন, এটা তো করাই যায়। তাঁর সম্মতি জেনে আমিও উৎসাহবোধ করলাম। বললাম, তাহলে আপনার পক্ষ থেকে তিন জনের নাম ঠিক করেন, জামায়াতের পক্ষ থেকেও তিন জন লোক ঠিক করা হবে। এ ৬ জন একত্রে বসে ইসলামী ইস্যুগুলোর তালিকা তৈরি করুন। তাঁরা যুগপৎ আন্দোলনের দাবিনামা হিসেবে একটা প্রস্তাবনা প্রণয়ন করবেন। এ প্রস্তাব ঐক্যজোট ও জামায়াত নিজ নিজ ফোরামে অনুমোদন করলে অথবা সংশোধন করে অনুমোদন দিলে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি শুরু হতে পারে।

আমার প্রস্তাবিত এ পদ্ধতির সাথে একমত হয়ে তিনি তাঁর জোটের পক্ষ থেকে তিন জনের নামও জানিয়ে দিলেন। আমি বললাম, জামায়াতের পক্ষ থেকে তিন জনের নাম আমি ফোরামে পরামর্শ করে পরে জানাব।



www.icsbook.info

এরপর তিনি প্রস্তাব দিলেন, আপনি এটা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। যুগপৎ আন্দোলনের লক্ষ্যে ইসলামী ইস্যুর তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে আপনার নিকট একটা লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হবে, যাতে ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বোঝা যায়। আমি বিনা দ্বিধায় তাঁর এ কথা মেনে নিলাম। আমি চাই যে, কাজটা হোক। জামায়াতের কৃতিত্বের প্রয়োজন নেই। অন্য কেউ কৃতিত্ব দাবি করলেও আপত্তি নেই।

আমি জানতে চাইলাম, আপনাদের পক্ষ থেকে ক'দিন পর লিখিত প্রস্তাব আশা করতে পারি? তিনি বললেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই পাবেন। সপ্তাহ পার হয়ে ১৫ দিন চলে গেল। মীর কাসেম সাহেবকে জানালাম, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; অতএব আর কত অপেক্ষা করা যায়?

শায়খুল হাদীস সাহেব চেয়েছিলেন, আমি যেন আমাদের দু'জনের আলোচনার বিষয় কারো কাছে প্রকাশ না করি। যাতে এ কথা প্রমাণ হয় যে, তাঁরই উদ্যোগে যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। তাঁর এ দাবি মেনে নিয়ে আমি সত্যিই কারো কাছে পূর্বেকার ঐ সাক্ষাতের খবর প্রকাশ করিনি। এমনকি আমার নিকটতম সাথী জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল নিজামী সাহেবকেও জানাইনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানাতে হলো।

## শায়খুল হাদীসের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিএনপি'র সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার পর আবার শেষ চেষ্টা হিসেবে পুনরায় জনাব মীর কাসেমকে তাঁর বাড়িতে শায়খুল হাদীস সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য বললাম। শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়। এ সাক্ষাতের সময় জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমেই আমি ৪ মাস আগে ঐ বাড়িতে আমাদের যে বৈঠক হয়, সে কথা উল্লেখ করি। কিন্তু যখন তাঁর পক্ষ থেকে আমার কাছে চিঠি পাঠানোর কথা মনে করিয়ে দিলাম তখন তিনি কিছুতেই তা স্মরণ করতে পারলেন না। আমি বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গেলাম। তিনিই দাবি করেছিলেন যে, উদ্যোগী ভূমিকা তাঁর হবে এবং অনুরোধ করেছিলেন, আমি যে উদ্যোগ নিয়েছি সে কথা যাতে কাউকে না বলি। অথচ তিনিই বিষয়টি ভুলে গেলেন। তিনি সে কথা মনে করতেই পারলেন না– এটা বিশ্বাস করা অস্বাভাবিক হলেও বিশ্বাস না করে উপায় কি? তাই নতুন করে ঐ পুরাতন কথাই তাকে আবার বললাম।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব ১৯৫১ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ৩১ জন আলেমের ঐতিহাসিক ২২ দফার কথা উল্লেখ করে ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরলেন। শায়খুল হাদীস সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ২২ দফার কপি আছে কি না? মাওলানা জবাবে বললেন, মূল উর্দু কপি এবং এর বাংলা অনুবাদ আমরা প্রচার করি।



www.icsbook.info

আমার আগের কথার জের ধরে বললাম, এবার বলুন আপনার পক্ষ থেকে যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়ে কবে চিঠি পাঠাবেন? তিনি বললেন, পাঠাতে দেরি হবে না; তবে চিঠির ড্রাফট তৈরি করে দিলে ভালো হয়। বিস্ময়ের কথা, তিনি চিঠি দেওয়ার ড্রাফটাও করতে অক্ষম; তবু রাজি হলাম।

তিনি বললেন, ঐ ২২ দফার কপিও সাথে পাঠাবেন। বললাম, আমরা ইসলামী ও জাতীয় ইস্যু নিয়ে ১৭ দফা প্রণয়ন করেছিলাম। বললেন, এর কপি, পাঠাবেন। বললাম, ৪/৫ দিনের মধ্যেই এসব মীর কাসেম সাহেবের হাতে পৌঁছে যাবে। তিনি আপনাকে পৌঁছাবেন।

যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মীর কাসেম সাহেবের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে ফোনে খবর নিলাম, তা যথাস্থানে পৌঁছানো হলো কি না। তিনি জানালেন, শায়খুল হাদীস সাহেব সফরে থাকায় তা কিছুটা বিলম্বে পৌঁছেছে।

দু'সপ্তাহ পরও আমার কাছে চিঠি না আসায় মীর কাসেম সাহেবকে খবর নিতে বললাম। তিনি আমাকে জানালেন, শায়খুল হাদীস সাহেব আপনাকে ফোন করবেন। দু'দিন পর ফোন এলো। যে ফোন ধরল সে আমাকে জানাল, মীর কাসেম সাহেব ফোন করেছেন। আমি ফোন ধরে আওয়াজ থেকে বুঝলাম, শায়খুল হাদীস সাহেব কথা বলছেন। বোঝা গেল, আমার বাড়িতে যে ফোন ধরল সেও যাতে জানতে না পারে যে, তিনি আমাকে ফোন করেছেন। তিনি জানালেন যে, তাঁর আরও সময় প্রয়োজন। আমি আর চাপাচাপি করা সমীচীন মনে করলাম না। কত সময় প্রয়োজন– জিজ্ঞেস করাও ঠিক মনে করিনি। বুঝতে পারলাম যে, তিনি আর এগুবেন না। এরপর আর তাঁকে বিরক্ত করিনি।

## সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যের প্রচেষ্টা

১৯৯৭ সাল থেকে ঝালকাঠির বয়োবৃদ্ধ আলেম মাওলানা আযীযুর রহমানের (কায়েদ সাহেব) উদ্যোগ, ফুরফুরার গদ্দীনশীন পীর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতা ও বাইতুল মুকাররমের খতীব সাহেবের অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ নেতৃত্ব সকল ইসলামী দল ও মহলকে যাতে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয় সেজন্য আল্লাহর দরবারে ধরনা ধরে আছি। আমার ইসলামী শক্তিসমূহের ঐক্যের স্বপ্ন সফল হওয়ার ব্যাপারে জাতীয় শারীয়াহ কাউন্সিলই শেষ ভরসা। নতুন করে আর কোনো প্রচেষ্টার সম্ভাবনা দেখছি না। ময়দানে আর যে ক'জন ইসলামী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, তাঁরা সকলের ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এমন কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই।

আমার উদ্যোগে জামায়াতে ইসলামী ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত সর্বদলীয় ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তার বিবরণ প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করেই আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। তা না হলে এ আন্তরিক প্রচেষ্টার কোনো রেকর্ড থাকবে না এবং দেশবাসীও এ ইতিহাস জানতে পারবে না।



www.icsbook.info

আমি আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে এবং আখিরাতে তাঁর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে বলে সে হিসাব কষেই বলছি, আমার বিবরণীতে সামান্য অসত্যও নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে কারো উপর দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে আমি এসব কথা লিখিনি। এই অতি সত্য বিবরণ থেকে পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে ইতিহাসের বিচারেই তা করা হবে। আমার নিকট এর কোনো প্রতিকার নেই। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

## পাকিস্তানে ইসলামী ঐক্যের সুফল

২০০২ সালে পাকিস্তানে ৬টি ইসলামী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'মুত্তাহিদা মজলিসে আমল' (MMA— সম্মিলিত কর্মপরিষদ) গঠন করে। ২০০২ সালের অক্টোবরে পার্লামেন্ট নির্বাচনে তাঁরা ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জাতীয় সংসদে ৬৮টি আসন দখল করে প্রধানবিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে। এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে তারা সকলে মিলে বিশটি আসনও পায়নি।

MMA সীমান্ত প্রদেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সেখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছে। তারা বেলুচিস্তানেও সরকারি দলের সাথে কোয়ালিশন করে সরকার কায়েম করেছে। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে মাওলানা মওদূদী (র)-এর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে আমি লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে অতিথি হিসেবে গিয়েছিলাম। সীমান্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমত দেখার লোভ সামলাতে না পেরে সেখানে গেলাম। মন্ত্রীদের সাথে তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানার সুযোগ হলো। আমার ঐ সফরের বিবরণ ৪৮ পৃষ্ঠার একটা পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম "পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন– ঐতিহাসিক ২২ দফা ঘোষণা– পাকিস্তানে ইসলামী ঐক্যের সুফল– সীমান্তে ইসলামী হুকুমত"। 'জীবনে যা দেখলাম'-এর ৪র্থ খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানে নিম্নোল্লিখিত ছয়টি ইসলামী দল নিয়ে MMA-এর গঠিত হয়েছে।

১. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান।

২. জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (মাওলানা ফযলুর রহমান)

৩. জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (মাওলানা সামীউল হক)

৪. জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান।

৫. জমিয়তে আহলে হাদীস।

৬. মিল্লাতে জাফরিয়া।

এ ৬টি দল যেসব মহলের প্রতিনিধিত্ব করে তার বিবরণ নিম্নরূপ :

উল্লেখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল সকল দেওবন্দীদের প্রতিনিধিত্ব করে। ৪র্থ দলটি ব্রেলভীদের প্রতিনিধিত্ব করে। ৫ম দলটি আহলে হাদীসের প্রতিনিধিত্ব করে। আর


www.icsbook.info

সর্বশেষ দলটি শিয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে। জামায়াতে ইসলামী ইকামাতে দীনের সমর্থক ঐসব জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা নিজেদেরকে উপরিউক্ত কোনো ফেরকার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না; যদিও সব ফেরকার লোকই তাতে শামিল আছেন।

## বাংলাদেশে কি পাকিস্তানের স্টাইলে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়?

বাংলাদেশে যেসব দলকে ইসলামী দল হিসেবে গণ্য করা যায় তাদের মধ্যে শিয়াদের কোনো দল নেই। তাদের সংখ্যাও নগণ্য। ব্রেলভী-খেয়ালের বিরাট জনশক্তি এ দেশে আছে। তাঁদের ওলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে সংগঠিত হলেও তাঁদের কোনো রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম নেই। তাঁদের কোনো দলই নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করায় না। তাঁদের অনুসারীদেরকে নির্বাচনে কোনো নির্দিষ্ট দলকে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় কি না তা আমার জানা নেই।

আহলে হাদীসের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের একাধিক সংগঠন রয়েছে। কিন্তু কোনোটিই রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য নয়। কারণ তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না। ছোট ছোট কয়েকটি ইসলামী দল এমন আছে, যারা রাজনৈতিক বক্তব্য রাখলেও নির্বাচনে প্রার্থী দেয় না। কয়েকটি ইসলামী দল মিলে 'ইসলামী ঐক্যজোট' হিসেবে গঠিত দলটি চারদলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এর বাইরেও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কিছু দল রয়েছে।

ইসলামী ঐক্যজোট বর্তমানে (২০০৫) চার ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে তিন ভাগের নেতৃত্বই দেওবন্দী আলেমগণের হাতে রয়েছে। পাকিস্তানে ওলামায়ে দেওবন্দ দু'গ্রুপে বিভক্ত হলেও উভয় গ্রুপ MMA-তে শরীক রয়েছে। বাংলাদেশের ওলামায়ে দেওবন্দও পৃথক পৃথকভাবেই ইসলামী ঐক্যের প্ল্যাটফরমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী ঐক্য পাকিস্তানের চেয়েও সহজ। এখানে শিয়া, আহলে হাদীস ও ব্রেলভীদের পৃথক পৃথক রাজনৈতিক মঞ্চ নেই। এখানে ইসলামী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা পাকিস্তানের চেয়ে কম। তাই এখানে ঐক্য স্থাপন মোটেই অসম্ভব কিছু নয়।

পাকিস্তানে এত রকম ফেরকা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এ কারণে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাঁরা সকল মতভেদ ভুলে ইসলামী সরকার কায়েমের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজ নিজ ফেরকার একক প্রচেষ্টায় এ মহান উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না বলে উপলব্ধি করার ফলেই তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন।

বাংলাদেশে যারা আল্লাহর আইন, আল্লাহর খিলাফত ও ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য পৃথক পৃথকভাবে যে আন্দোলন করছেন তাতে তারা কেউই সফল হবেন না।



www.icsbook.info

তবে তারা সবাই যদি ইসলামী হুকুমত কায়েমের ফরযিয়াত সম্পর্কে সচেতন হন তাহলে তাঁদের ঐক্যের পথে কোনো বাধাই থাকার কারণ নেই।

## জামায়াতে ইসলামীর সাথে ঐক্য স্থাপনে আপত্তি

জামায়াতে ইসলামীর সাথে ঐক্যের ব্যাপারে যারা আপত্তি তোলেন, তারা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত কতক অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়েই তা করেন বলে মনে হয়। উর্দু ভাষায় লেখা মাওলানার বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার তো পাকিস্তানেই ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত। বাংলাদেশে তো উর্দু ভাষার অনেক সাহিত্য পাওয়াই যায় না। পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম মাওলানা মওদূদীর লেখায় এমন আপত্তিকর কিছু পাননি, যার কারণে জামায়াতের সাথে ঐক্য করাই চলে না। ৬ দলীয় ইসলামী ঐক্যজোটের বর্তমান সভাপতি হচ্ছেন, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর কাযী হোসাইন আহমদ।

এককালে যারা জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রচার করতেন তাঁরাও জামায়াতের সাথে মিলে সীমান্তে ইসলামী হুকুমত পরিচালনা করছেন। তাঁরা শুধু রাজনৈতিক ঐক্য করেননি, আদর্শিক ঐক্যও করেছেন। দেওবন্দী ও ব্রেলভী এককালে বাহাস ও পরস্পর ফতোয়াবাজিতে লিপ্ত ছিলেন। এখন তাঁরা একসাথে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের পারস্পরিক সকল মতপার্থক্য দূর হয়ে যায়নি; তবে তাঁরা দীনের বিজয়কে গুরুত্ব দিয়ে মতবিরোধকে পেছনে ফেলে রেখেছেন।

বাংলাদেশেও পাকিস্তানের মতো ঐক্য হতে পারে, যদি সবাই ইকামাতে দীনকে প্রাধান্য দেন।

## ইসলামী দলগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে কেন?

এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইসলামী জনতা সকল ইসলামী দলের ঐক্যের জন্য পাগল। ঐক্যের কোনো প্রচেষ্টা দেখলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবেগের সাথে তাতে সাড়া দেয়। আর আলেমদের মধ্যে বিভেদ ও ইসলামী দলগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখলে তারা তাতে অত্যন্ত বেদনাবোধ করে।

ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যারা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে জামায়াতে ইসলামীর সাথে "রাজনৈতিক ঐক্য করেছি, আদর্শিক ঐক্য করিনি" বলে ঘোষণা দেন, তারা তাহলে ইসলামী ঐক্যজোটে কেন ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারলেন না? চারদলীয় জোটের শরীক ইসলামী ঐক্যজোট চার ভাগে বিভক্ত হলো– রাজনৈতিক কারণে, নাকি আদর্শিক কারণে? হাফেযজী হুযুরের প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলন থেকে শায়খুল হাদীস সাহেব আলাদা হয়ে খেলাফত মজলিস গঠন করলেন কী কারণে? তাঁর দলের দু'জন নায়েবে আমীর আলাদা খেলাফত মজলিস কায়েম করলেন কোন্ যুক্তিতে? হাফেযজী হুযূরের ছেলেদের নেতৃত্বে পরিচালিত ক্ষুদ্র


www.icsbook.info

দলটিকে দু'ভাই সম্প্রতি বিভক্ত করে নিলেন; 'নেজামে ইসলাম পার্টি' নামের ক্ষুদ্র দলটির নির্বাহী সভাপতি মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐ নামেই পৃথক দল গঠন করলেন। তাদের এই দল ভাঙার কারণ কি আদর্শিক, না রাজনৈতিক?

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের একজন নেতা, যিনি এর চেয়ারম্যান মাওলানা উবায়দুল হকের (খতীব সাহেব) অনুপস্থিতিতে বহু বার শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন, তিনি পাল্টা জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল কায়েম করে নিজেকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করলেন; কিন্তু তা তিনি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হননি। সর্বদলীয় একমাত্র ইসলামী ঐক্যমঞ্চ হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি শরীয়াহ্ কাউন্সিলে শরীক থাকাটাই স্বাভাবিক। আর এর প্রতিবাদেই নাকি খতীব সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত মঞ্চ তিনি ত্যাগ করেছেন। তিনি ভিন্ন নামে মঞ্চ কায়েম করে চেয়ারম্যান হওয়ার চেষ্টা করতে পারতেন, কিন্তু 'জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল' নামটি দখল করার ব্যর্থ চেষ্টা কেন করলেন তা বোঝা গেল না। তিনি কি এখন জামায়াতে ইসলামী ছাড়া বাকি সকল ইসলামী দল ও মহলকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করছেন?

**জামায়াতকে বাদ দিয়ে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা!**

২০০৫ সালের ১২ মে দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় দু'কলাম খবরের শিরোনাম ছিল, "জামায়াত ব্যতীত সকল ইসলামী দলের গোল টেবিল বৈঠক"। এর আয়োজক 'ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশ'।

ঐদিনের পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় উক্ত গোল টেবিল বৈঠকের বিজ্ঞাপনে অতিথিদের তালিকায় প্রথম নাম দেখা গেল বায়তুল মুকাররমের খতীব সাহেবের। অংশগ্রহণকারী অতিথিদের তালিকায় মোট ২৬ জনের নাম ছিল।

পরের দিন দৈনিক ইনকিলাবে এ গোলটেবিল বৈঠকের যে খবর বের হলো তা দেখে বিস্মিত হলাম। কারণ, বায়তুল মুকাররমের খতীব সাহেব ঐ বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন এবং জামায়াতের বিরুদ্ধে কোনো বক্তার বক্তব্যই উক্ত খবরে প্রকাশিত হয়নি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এবং মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোবায়েদুর রহমান। প্রধান বক্তা ছিলেন দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক জনাব এএমএম বাহাউদ্দীন।

এ গোল টেবিল বৈঠকটি 'ইসলামী পত্রিকা পরিষদ'-এর নামে আহ্বান করা হলেও এতে জামায়াতের সাথে সম্পর্কিত কোনো দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার কোনো প্রতিনিধিকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। অথচ ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে দাবি করে এমন ক্ষুদ্রতম সকল দলকেও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে দাওয়াত করায় মুহতারাম খতীব সাহেব সেখানে যাননি। কেননা, তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত



www.icsbook.info

নন। জামায়াত ছাড়া সকল দলকে দাওয়াত করায় এটাই ধারণা ছিল যে, কেউ কেউ নিশ্চয়ই জামায়াতের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবেন। কেউ তেমন কোনো বক্তব্য না রাখার কারণ হিসেবে জানা গেল, মডারেটর জনাব মোবায়েদুর রহমান শুরুতেই সমবেত সবার নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করেন যে, "আমরা ঐক্যের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি। এখানে সবাই ঐক্যের পক্ষেই কথা বলব। কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলব না।"

সমবেত সবাই সর্বসম্মতভাবে এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তাই কোনো বক্তা ইশারা-ইঙ্গিতেও তেমন কিছু বলার চেষ্টা করলে মডারেটর সাহেব ঐ প্রস্তাবের দোহাই দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করেন।

## ইসলামী ঐক্যজোট ভাঙনের নেপথ্যে

২০০১ সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোট বিজয়ী হওয়ার পর জোটের শরীক দুটো ইসলামী দলের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে বলে আশা করেছিলাম। কেননা এর মাধ্যমে অন্যান্য ইসলামী শক্তিকেও ঐক্যে শামিল করার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু ১০ অক্টোবর (২০০১) চারদলীয় জোটের মন্ত্রিসভা গঠনের দিনই ইসলামী ঐক্যজোটে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল।

ইসলামী ঐক্যজোট থেকে প্রথমে মাত্র দু'জন এমপি নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হককে মন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানলাম। তখন আমি ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার শহরে ছিলাম। ফোনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মুজাহিদ সাহেবের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে খবর পাচ্ছিলাম। ৯ অক্টোবর তিনি জানালেন, শায়খুল হাদীস মন্ত্রী হচ্ছেন।

১০ তারিখ ইন্টারনেট থেকে মন্ত্রীদের নামের তালিকা সংগ্রহ করে দেখলাম, শায়খুল হাদীসের নাম নেই। মুজাহিদ সাহেব থেকে জানা গেল, গতরাতে মাওলানা ফযলুল হক আমিনী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যাতে তাঁকে ঐক্যজোট থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মন্ত্রী নিয়োগ করছেন না। আরও জানা গেল, যে কয়টি গ্রুপ ও দল নিয়ে ইসলামী ঐক্যজোট গঠন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে খেলাফত মজলিস ছাড়া বাকি গ্রুপগুলো আমিনী সাহেবের সাথে চলে গেছে।

জানতে চাইলাম, আমিনী সাহেবকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হচ্ছে না কেন? তিনি বললেন, বেগম জিয়া নাকি নির্বাচনে নমিনেশন চূড়ান্ত করার পূর্বেই মাওলানা আমিনীকে নির্বাচনে না দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, আপনাকে মন্ত্রী নিয়োগ করব– যদি এমপি হিসেবে নমিনেশন না নেন। আমিনী সাহেব তখন বলেছিলেন, আমি মন্ত্রী হতে চাই না, এমপি হতে চাই।



www.icsbook.info

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় পূর্বের তিনটি নির্বাচনে বিএনপি নেতা উকীল আবদুস সাত্তার ভূঞা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। এলাকায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ সত্ত্বেও আমিনী সাহেব এমপি হওয়ার দাবি জানানোর কারণে তাকেই এ আসনটি ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বিএনপি'র দলীয় প্রতীক ধানের শীষই তাকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। বেগম জিয়ার নির্দেশে সাবেক এমপি উকীল সাহেবও মাওলানা আমিনীর পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে সক্রিয় হন এবং এমপি হওয়া থেকে বঞ্চিত রাখার বিনিময়ে উকীল সাহেবকে প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এ পরিস্থিতিতে আমিনী সাহেবের মন্ত্রিত্ব দাবি করার তো কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকে না।

গত বছর চারদলীয় জোটের শীর্ষ বৈঠকে মাওলানা আমিনী ইসলামী ঐক্যজোট থেকে মন্ত্রী না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি এমপি হতে চেয়েছিলেন বলে তাকে এমপি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তিনি মন্ত্রী হতে চাননি বলেই তো তাকে এমপি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এখন আবার মন্ত্রী হতে চান কেন? শীর্ষ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের নিকট তিনি পদত্যাগ করার হুমকি দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এমপি পদ ত্যাগ করেননি।

## মাওলানা আমিনী জামায়াতবিরোধী কেন?

২০০৪ সালের এপ্রিলের ২৬ তারিখে 'প্রথম আলো' নামক একটি ধর্ম-নিরপেক্ষবাদী পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলো, আলিয়া মাদরাসাসমূহের লাইব্রেরিতে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে সহায়ক বইয়ের তালিকায় মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীরও রয়েছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব বই কিনে মাদরাসাগুলোতে বিতরণ করবে।

পত্রিকায় এ খবর দেখে সর্বপ্রথম মাওলানা ফযলুল হক আমিনী এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। চিহ্নিত ইসলামবিরোধী পত্রিকাগুলো ফলাও করে তার বলিষ্ঠ বিবৃতি প্রকাশ করে। ইসলামী ঐক্যজোটের অপর গ্রুপের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস সাহেব কয়েকদিন পর একই ধরনের বিবৃতি দিলেন। তাঁর বিবৃতিও ঐসব পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়।

ইসলামী ঐক্যজোটের দু'গ্রুপের দু'চেয়ারম্যান কাওমী মাদরাসার নেতা ও শিক্ষক। আলিয়া মাদরাসার কোনো শিক্ষক বা জমিয়তুল মুদাররিসীনের কোনো নেতা এ জাতীয় বিবৃতি দেননি। আলিয়া মাদরাসার ছাত্ররা মাওলানা মওদূদীর তাফসীর পড়ে গোমরাহ হয়ে যাবে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেননি। কারণ, তাঁরা মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীর পড়ে এতে আপত্তিকর কিছুই পাননি। বরং তাঁরা মনে করেন যে, মাদরাসার ছাত্রদের এ তাফসীর পড়া উচিত, যাতে তারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত মহলের নিকট কুরআনের আলো বিতরণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।



www.icsbook.info

মাওলানা মওদূদী আজীবন এ শিক্ষা প্রদান করে গেছেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া আর কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই মাওলানা মওদূদীর লেখায় ভুল থাকতেই পারে। ১৯৮৯ সালের এপ্রিলে সকল ইসলামী দলের শীর্ষ বৈঠকে আমি আবেদন জানিয়েছিলাম, মাওলানা মওদূদীর বইসমূহের ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে বাধিত হব। বৈঠকের সভাপতি শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক মন্তব্য করলেন, "অধ্যাপক সাহেব বল আমাদের কোর্টে ফেলে দিলেন। এখন এটা আমাদের দায়িত্ব.....। আমরা যদি মাওলানা মওদূদীর রচনায় ভুল চিহ্নিত করে দেই তাহলে তিনি জামায়াতের মধ্যে তা কাজে লাগাতে পারবেন।" এ উদ্দেশ্যেই আমি ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে হাফেযজী হুযুরের নিকট এই দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলাম, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

আমার ধারণা যে, যদি তাঁরা এ দায়িত্বটি গ্রহণ করতেন তাহলে মাওলানার রচনাবলি পড়ার সুযোগ পেতেন এবং আলিয়া নেসাবের আলেমগণ এগুলো পড়ার কারণেই যেমন জানেন এতে আপত্তিকর কিছু নেই তেমনি তাঁরাও জানতে পারতেন।

## কাওমী মাদরাসার নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

মাওলানা মওদূদীর রচিত সাহিত্য কাওমী মাদরাসার নেতৃবৃন্দ নিজেরা তো পড়েনই না, মাদরাসার কোনো শিক্ষক ও ছাত্র যাতে তা না পড়েন সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যদি তাঁরা জানতে পারেন যে, কেউ তা পড়েন তাহলে শিক্ষক হোক বা ছাত্র হোক তাঁকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করা হয়। দীন ইসলামের মহান খাদিম হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁরা এমন ভূমিকা পালন করছেন তা আমি জানার চেষ্টা করেছি। তাঁদের নেক নিয়তের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি মনে করি, তাঁরা ইসলামবিরোধী ভূমিকা পালন করতে পারেন না। তাহলে তাদের ঐ ভূমিকার ব্যাখ্যা কী?

আমি ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে এম এ পরীক্ষা দিয়ে তাবলীগ জামায়াতে তিন চিল্লায় বের হই। দিল্লীতেও চিল্লা দেই। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে যোগদানের পূর্বে আমি এদেশের তাবলীগ জামায়াতের দায়িত্বশীলগণের মধ্যে গণ্য ছিলাম। তাই হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের অনেক বড় আলেম– বিশেষ করে বাংলাদেশের তাবলীগ জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল আযীযের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি জানতে পারলাম, তাঁরা অনেকেই ধারণা করছেন যে, আমি জামায়াতে যোগদান করে গোমরাহ হয়ে গিয়েছি।

আমি তখন রংপুর কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতা করছি। আমার ঠিকানায় দিল্লী, করাচিসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বহু ফতোয়া ও তীব্র সমালোচনামূলক পুস্তক-পুস্তিকা পৌঁছে গেল। এ সম্পর্কে 'জীবনে যা দেখলাম'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।



www.icsbook.info

রংপুর কলেজে থাকাকালে পড়ার জন্য প্রচুর সময় পেতাম। তখনই আমি ঐসব বই পড়ে নিলাম এবং মাওলানা মওদূদীর যেসব বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে সবও সংগ্রহ করে যাচাই করলাম। ঐ যাচাইয়ের ফলাফল এখানে উদ্ধৃত করছি :

১. কোনো কোনো লেখকের সমালোচনায় মোটেই বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। তাঁরা নিরপেক্ষ হয়ে এবং যুক্তি দেখিয়ে মাওলানার কোনো কোনো বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। এর দ্বারা আমি এ শিক্ষা পেলাম যে, মাওলানা মওদূদীকে সম্পূর্ণ নির্ভুল মনে করে অন্ধভাবে তাঁর সব কথা গ্রহণ করা উচিত নয়। যেহেতু নবী ছাড়া কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়, তাই যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেই তাঁর লেখা পড়তে হবে।

২. কতক লেখকের ভাষা বিদ্বেষপূর্ণ। যুক্তি দিয়ে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে পাঠককে বিভ্রান্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য। এর জন্য তারা নিম্নোক্ত তিন ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছেন :

   ক. মাওলানার লেখা থেকে উদ্ধৃত করার সময় কোথাও বাক্যের পূর্বের কথা বাদ দিয়ে, আবার কোথাও পরের বাক্য উল্লেখ না করে কোনো বাক্যের শুধু ঐ অংশটুকু তুলে ধরা হয়েছে, যা যে কারো কাছে আপত্তিকর মনে হবে।

   খ. কোথাও কোথাও মাওলানার কথার সাথে শুরু বা শেষে এমন শব্দ যোগ করা হয়েছে, যা মাওলানার বক্তব্যকে বিকৃত করে দিয়েছে।

   গ. কোথাও এমন কোনো বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা অন্য লোকের বক্তব্য হিসেবে মাওলানার বইয়ে তিনি উদ্ধৃত করে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। অথচ ঐ বাক্যটি মাওলানার বইয়ে থাকার কারণে তা তাঁর বক্তব্য হিসেবেই দেখানো হয়েছে।

৩. একজন লেখক এমন পেলাম, যিনি বিদ্বেষ পোষণ করেন না বটে; কিন্তু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের যে তাৎপর্য মাওলানা মওদূদী পেশ করেছেন তার সাথে তিনি একমত নন। আমার ধারণা হলো, তিনি ইসলামকে 'ধর্ম' হিসেবে বিশ্বাস করেন। ইসলাম যে একটি বিপ্লবী আন্দোলন তা তিনি মনে করেন না।

যাহোক, বিরোধীদের লেখা বই থেকে আমি নিম্নরূপে উপকৃত হয়েছি :

১. এ বইগুলো আমাকে মাওলানা মওদূদীর বহু বই অল্প সময়ের মধ্যে পড়তে বাধ্য করেছে। এ সময়ের মধ্যে এত বই স্বাভাবিকভাবে পড়া হতো না। এতে ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

২. মহব্বত ও আবেগের তাড়নায় যেন মাওলানা মওদূদীর সকল মতামত ও বক্তব্যকে নির্ভুল মনে না করি, সে ব্যাপারে আমাকে সচেতন থাকতে ঐ



www.icsbook.info

বইগুলো সাহায্য করেছে। কুরআন ও হাদীসের যুক্তি ব্যতীত কোনো কথা যেন শুধু মাওলানার বক্তব্য বলে দলীল হিসেবে গ্রহণ না করি, সে বিষয়েও আমাকে সাবধান থাকতে উপদেশ দিয়েছে।

৩. ইখলাসের সাথে সংশোধনের নিয়তে সমালোচনার ভাষা এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি ও বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। এ বইগুলো থেকে দ্বিতীয় প্রকার লেখার বক্তব্য উপেক্ষা করা ও প্রথম প্রকার লেখার যুক্তি বিবেচনা করার কৌশল শিখেছি।

## এ ফতোয়াবাজির পটভূমি

বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতারাম মুহতামীম ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ-প্রধান মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র) 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' নামক এক পুস্তিকায় ভারতের হিন্দু-মুসলিম-শিখ-বৌদ্ধ ইত্যাদি সকলে মিলে এক ভারতীয় কাওম (জাতি) বলে দাবি করেছিলেন। এ দাবি মূলত ভারতীয় কংগ্রেস দলের। মি. গান্ধি ও নেহরু এ মতবাদের নেতা। অথচ মাওলানা মাদানী (র) এ মতবাদকেই ঐ পুস্তিকায় ইসলামসম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন।

১৯৩৯ সালে মাওলানা মওদূদী এ মতবাদের সমালোচনা করে 'মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত' নামে একটি বই লেখেন। তাতে তিনি কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের যুগের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেন যে, মুসলিম আলাদা জাতি। হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে মিলে মুসলিমরা এক জাতি হতে পারে না। এ মতবাদ মুসলিম লীগের পক্ষে যায়। মাওলানা মওদূদীর এ বইটি বাংলায় 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' নামে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

লাহোরে অনুষ্ঠিত ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগ সম্মেলনে ভারত বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ময়দান উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তখন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের দাবিদার এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের দাবিদার হিসেবে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত হয়।

কংগ্রেস দল মুসলমানদের সমর্থন হাসিলের জন্য মাওলানা মাদানী (র)-এর 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' বইটি তাদের জনসভায় পড়ে শোনাতে থাকে। আর মুসলিম লীগ মাওলানা মওদূদীর 'মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত' বইটি তাদের জনসভায় পড়ে মুসলিম জনগণকে জাতীয়তার প্রকৃত অর্থ বোঝাতে থাকে।

মাওলানা মওদূদীর বইটিতে তিনি মাওলানা মাদানীর নাম নিয়ে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর মতামতকে ইসলামবিরোধী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য অত্যন্ত জোরালো যুক্তি পেশ করেছেন।



www.icsbook.info

এ পরিস্থিতিতে মুসলিম জনগণের নিকট স্বাভাবিক কারণেই মাওলানা মাদানী (র)-এর ভাবমর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছিল। মাওলানা মাদানী (র)-এর শারগিদ ও মুরীদগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা। মাওলানা মাদানী শুধু মাদরাসার উস্তাদই নন, পীরও বটে। তাই তাঁর প্রতি যাঁদের গভীর মহব্বত রয়েছে তাঁরা মাওলানা মওদূদীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

পরবর্তীকালে মাওলানা মওদূদীর বিভিন্ন পুস্তক ও তাঁর লেখা তাফসীর থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেওবন্দ, সাহারানপুর ও বিভিন্ন মাদরাসার মুফতীগণের নিকট ফতোয়া চাওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, তারা ফতোয়া তলবের সেই আবেদনে উদ্ধৃতি পেশ করার সময় মাওলানা মওদূদীর লেখা থেকে কিছু অংশ বাদ দেয় বা তাঁর বক্তব্যের সাথে কিছু অংশ যোগ করে। ফলে মাওলানা মওদূদীর মূল বক্তব্যের অর্থ বিগড়ে যায় এবং মুফতীগণ ঐসব ভুল উদ্ধৃতিকেই সঠিক ধারণা করে ফতোয়া দিয়েছিলেন। মুফতীগণ জেনে-বুঝে মাওলানা মওদূদীকে হেয় করার নিয়তে ঐ ফতোয়া দিয়েছিলেন বলে আমরা মনে করি না। তাঁরা যে রকম উদ্ধৃতি পেয়েছেন এর ভিত্তিতেই ফতোয়া দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী মুফতী সাহেবদের নিকট অপরিচিত নন। আল জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর লেখা নিশ্চয়ই তাঁরা পড়েছেন। অবশ্য মাওলানার নামে এমন সব জঘন্য কথার উদ্ধৃতি দেখার পর তাঁদের উচিত ছিল, মাওলানার মূল বই পড়া।

মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতাকারী একশ্রেণীর আলেম মাওলানা মওদূদীর লেখা কিতাবাদির মিথ্যা উদ্ধৃতি বহু বছর থেকে প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমার বাড়িতে চরমোনাইর পীর সাহেবের উপস্থিতিতে আমার আপন ভাগ্নি-জামাই (দেওবন্দ মাদরাসা পাস) দুটো উদ্ধৃতি নোট বই থেকে শোনালে মূল বই দেখার পর তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

মাওলানা মওদূদীর লেখা পুস্তকাদি না পড়েই কাওমী মাদরাসার একশ্রেণীর আলেম ঐসব মিথ্যা উদ্ধৃতি অব্যাহতভাবে প্রচার করে চলেছেন।

### একটা বড় উদাহরণ

কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার 'আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম'-এর 'আফতাব' নামে প্রকাশিত ২০০৩ সালের বার্ষিক স্মরণিকায় মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে কয়েকটি মিথ্যা উদ্ধৃতি প্রকাশ করা হয়।

স্থানীয় আলেম বরুড়া ধনীশ্বর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান, ঐ স্মরণিকার সম্পাদক ও মাদরাসার দায়িত্বশীল শিক্ষকদের নিকট আপত্তি জানান যে, মাওলানা মওদূদীর বই থেকে যেসব উদ্ধৃতি প্রচার করা হয়েছে তা মিথ্যা।



www.icsbook.info

অতএব আপনারা প্রমাণ করুন যে, তাঁর বইয়ে এসব জঘন্য কথা লেখা আছে। এতে তারা মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমানের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। তিনি তখন তাদের কাছে উকিল-নোটিশ পাঠান এবং তারা তাতে সাড়া না পাওয়ায় তিনি কুমিল্লার দেওয়ানি আদালতে ১ম শ্রেণীর হাকীমের কোর্টে ২০০৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর একটি মামলা দায়ের করেন। (মামলা নং ২১৯/২০০৪)

মামলার বাদী, ৯ জন আলেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এলাকার জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। তারা মাওলানা মওদূদীর যেসব পুস্তকের নাম উল্লেখ করে সেগুলো থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা জঘন্য মিথ্যা। কারণ, এমন কোনো কথাই মাওলানা মওদূদী লিখেননি।

আদালত মামলা গ্রহণ করে বরুড়া থানার ওসিকে তা তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন। থানার ওসি তাদেরকে তলব করলে প্রথমে তারা পরওয়াই করেননি। গ্রেফতারের ভয় দেখালে তাদের মধ্যে ৫ জন থানায় লিখিতভাবে জানান যে, স্মরণিকার সম্পাদক কোনোরূপ সম্মতি না নিয়েই তাদের নাম ব্যবহার করেছেন। তাই তারা এর সাথে জড়িত নন। সম্পাদক এলাকা থেকে অনেক আগেই পালিয়ে গেছেন। বাকি ৩ জনও এলাকার বাইরে। এমতাবস্থায় থানার পূর্ববর্তী ভারপ্রাপ্ত অফিসার কোর্টে যে রিপোর্ট পাঠান তা পূর্ণাঙ্গ নয় বলে বর্তমান (জুন, ২০০৫) ওসির প্রতি আদালত পুনরায় তদন্তক্রমে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

## ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ফেতনাবাজ আলেমদের একই ভূমিকা

বরুড়া থানার ফেতনাবাজ আলেমদের মতো ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায়ও কতক ফেতনাবাজ আলেম ঐ সব মিথ্যা উদ্ধৃতি প্রচার করেছেন। তাদের প্রচারিত বিজ্ঞাপনটির মধ্যে চারটি উদ্ধৃতি রয়েছে, যা বরুড়ায় প্রকাশিত স্মরণিকায়ও ছিল।

বরুড়ায় মামলা দায়েরকারী বাদী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান ২৫.০৬.০৫ তারিখে তাঁর মামলার কাগজপত্র আমার কাছে দিয়ে গেলেন। তাঁকে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিজ্ঞাপনে প্রচারিত ৪টি উদ্ধৃতি যাচাই করার জন্য মাওলানার লেখা তাফসীর ও অন্যান্য বই বের করে দেখলাম। তাদের দেওয়া পৃষ্ঠা ঠিকই মিলল। কিন্তু উদ্ধৃতিতে বেঈমানীর আলামত পেলাম। যেমন তারা উদ্ধৃত করেছেন, "হযরত ইবরাহীম (আ) ক্ষণিকের জন্য শিরকের গুনাহে নিমজ্জিত ছিলেন।"

অথচ মাওলানা লিখেছেন, "কতক লোক এ ভুল ধারণা করতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ক্ষণিকের জন্য শিরকের গুনাহে নিমজ্জিত ছিলেন।"

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এ রকম অপবাদ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ঈমান, আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনা আছে বলে মনে হয় কি?



www.icsbook.info

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়ও এ জাতীয় ফেতনাবাজ আলেমদের বিরুদ্ধে কেউ মামলা দায়ের করলে তাদেরও, বরুড়ার আসামীদের দশাই হবে– এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মাওলানা আবদুর রহমান সেদিন বলে গেলেন, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ায় ফেতনাবাজ আলেমরা অন্যত্র চলে গেছেন। বর্তমানে মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রগণ মাওলানা মওদূদীর বই পড়তে আগ্রহী হয়েছেন। এমনকি মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' মাদরাসার লাইব্রেরিতে রাখার সিদ্ধান্তও নাকি গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের পথে চলতে সাহায্য করুন। আমাদের দেশে এমন যোগ্য আলেমও রয়েছেন, যাঁরা মাওলানা মওদূদীর বই পড়লে ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারতেন।

## সাধারণ জনগণের কাছে আলেম সমাজই দীনী ইলমের উৎস

আমাদের দেশে কোটি কোটি মুসলমান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে মহব্বত করে এবং আল্লাহর কিতাব কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। যারা মাতৃভাষা পড়তে জানে না, তাদের মধ্যেও অনেকে কুরআন তিলাওয়াত করে। কেউ রাসূল ও কুরআনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে বেনামাযীরাও তা সহ্য করে না। ভোট পেতে হলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ধানের শীষে বিসমিল্লাহ' স্লোগান দিয়ে জনগণকে আশ্বাস দিতে হয় যে, এ স্লোগানদাতারাও আল্লাহ-রাসূলের ভক্ত। ইসলামের প্রতি জনগণের এই যে ভালোবাসা, তাদের মধ্যে এই যে ইসলামী চেতনা তা নিঃসন্দেহে আলেম সমাজেরই মূল্যবান অবদান।

মসজিদের ইমাম, খানকাহর পীর, মাদরাসার মুদাররিস, ওয়ায়েয ও তাবলীগ জামায়াতের মুবাল্লিগগণ যেটুকু দীনের আলো জনগণের নিকট পৌঁছাচ্ছেন সেটুকু ছাড়া তারা আর কোথা থেকে আলো পাবে!

প্রায় দু'শ বছর এ দেশ ইংরেজদের গোলাম ছিল। ওরা যেখানেই শাসনক্ষমতা পেয়েছে সেখানেই জনগণকে খ্রিস্টান বানাতে সক্ষম হয়েছে। ইংরেজরা এদেশে যত লোককে খ্রিস্টান বানাতে পেরেছে তারা প্রধানত হিন্দু-বৌদ্ধ বা উপজাতি ছিল; তারা মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান বানাতে পারেনি। এটা ওলামায়ে কেরামেরই বিরাট অবদান।

ইংরেজ আমলের আগে এ দেশে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে কম ছিল। ইংরেজ আমলেই হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে। এটাও আলেমদেরই অবদান।

আলেমগণ জনগণের সহযোগিতা নিয়ে মাদরাসাগুলোর মাধ্যমে আলেমবাহিনী গড়ে না তুললে মসজিদগুলোও বিরান হয়ে যেত। আমাদের দেশে জনগণের মধ্যে যে দীনী জযবা, ইসলামী জোশ ও মুসলিম চেতনা রয়েছে এর সবটুকুর কৃতিত্বই আলেম



www.icsbook.info

সমাজের। তাঁরা মাদরাসাসমূহে দীন সম্পর্কে যেটুকু ধারণা পেয়েছেন তা-ই জনগণের নিকট পরিবেশন করছেন।

## ইংরেজ আমলে মাদরাসার মান

এ দেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছর মুসলিম শাসন ছিল। তখন একই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। ঐ শিক্ষায় শিক্ষিতরা এমন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পেতেন, যার ফলে সরকারি ও বেসরকারি সকল বিভাগে তাঁরা দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতেন। একাধারে ধর্মীয় ও সরকারি দায়িত্ব পালনের উপযোগী শিক্ষাই তাঁরা পেতেন।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন যাবতীয় খরচ এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতা মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি থেকেই নির্বাহ করা হতো। ১৭৫৭ সালেই ইংরেজদের রাজত্ব কায়েমের পর তাদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার সাথে সাথে ঐসব ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। আলেম সমাজ দীনী শিক্ষা ও মুসলিম জাতির ঈমানের হেফাজতের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আবার সেই মাদরাসা শিক্ষা চালু করেন।

আমাদের দেশে সরকার বিরাট অংকের টাকা ব্যয় করেও শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি করতে পারছে না। বাস্তব কারণেই ইংরেজ আমলে সরকারি সাহায্য ছাড়া মাদরাসা শিক্ষাকে মুসলিম আমলের মতো উন্নত করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মাদরাসা-শিক্ষিতদের সরকারি চাকরির কোনো সুযোগও তখন ছিল না। মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার শিক্ষক পদ ছাড়া অন্য কোনো পদে তাদের চাকরি পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যে শিক্ষার পর দুনিয়ার উন্নতির কোনো সুযোগ নেই, সে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সচ্ছল লোকেরা তাদের সন্তানদেরকে পাঠাত না। মেধাবীদেরও এ শিক্ষার প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। এ শিক্ষায় শুধু তারাই নিজেদের সন্তানদেরকে পাঠাতেন, যারা দুনিয়ার বদলে আখেরাতের সাফল্যই কামনা করেন।

যেকোনো শিক্ষাব্যবস্থা ময়দানের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই লোক তৈরি করে। কিন্তু তখন ময়দানে ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদির কোনো চর্চাই ছিল না। তাই মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। অতএব মাদরাসা তখন শুধু মসজিদের ইমামতি, মাদরাসায় কুরআন-হাদীস-ফিক্‌হের শিক্ষকতা এবং নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত ও বিয়ে-তালাক-ফারায়েয ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিম জনগণের ধর্মীয় দাবি পূরণের দায়িত্ব পালন করত।

আমার দাদা ঢাকার বিখ্যাত মুহসেনিয়া মাদরাসা-পাস আলেম ছিলেন। আমাদের এলাকায় বহু দূর পর্যন্ত এত বড় কোনো আলেম ছিলেন না। তাই অনেক দূর থেকেই মসজিদের ইমাম ও সমাজের গণ্যমান্য লোক দাদার কাছে আসতেন। তালাক ও



www.icsbook.info

ফারায়েযের মাসয়ালা নিয়েই বেশি লোক আসতেন। দাদা আরবী ভাষায় লেখা ফিক্‌হের বড় বড় কিতাব খুলে তাদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সময় দিতেন। হজ্জ-যাকাতের চর্চাও মাঝে মাঝে হতো। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কোনো মাসায়ালা নিয়ে কেউ তাঁর কাছে এসেছেন বলে শুনিনি।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মাদরাসার সিলেবাসে থাকার প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাস, ভূগোল, অংক শেখারও প্রয়োজন ছিল না। ময়দানের দীনী প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালনের যোগ্য লোকই মাদরাসায় তৈরি করা হতো। এসব মাদরাসায় পড়া আলেমগণই যদি মসজিদ, খানকাহ ও ওয়ায মাহফিলে ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষাটুকু জনগণের নিকট বিতরণ না করতেন তাহলে জনগণ মুসলিম চেতনাই হারিয়ে ফেলত। আর মাদরাসাগুলো যদি না থাকত তাহলে এদেশে কুরআন-হাদীসের কোনো চর্চাই থাকত না।

ইংরেজদের গোলামি থেকে আমরা ১৯৪৭ সালে মুক্তি পেয়েছি। ১৯৭১ সালে আমরা পাঞ্জাবীদের থেকেও স্বাধীন হয়েছি। এ পর্যন্ত আমাদের দেশে এমন কোনো সরকার কায়েম হয়নি, যারা শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী জীবনবিধানের আলোকে গড়ে তোলার যোগ্যতা রাখে বা সেজন্য ইচ্ছা পোষণ করে। আলিয়া মাদরাসাগুলোতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যতটুকু শেখানো হয় তা স্কুল-কলেজের সেক্যুলার শিক্ষারই অনুরূপ। এটা শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামিকরণ নয়। মাদরাসায় দাখিল ও আলিম পাস করে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে পারে শুধু সে ব্যবস্থাটুকুই এতে রাখা হয়েছে। কাওমী মাদরাসায় আলিয়া মাদরাসার মতো ব্যবস্থাও চালু হয়নি। প্রাচীন ব্যবস্থাই বহাল রয়েছে। অবশ্য বর্তমানে কিছু বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা আগে ছিল না।

যারা এ প্রশ্ন তোলেন যে, কাওমী মাদরাসায় ইসলামী জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই কেন, তারা ঐসব মাদরাসা-কর্তৃপক্ষের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেন। কেননা ঐ রকম শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি উদ্যোগ ছাড়া কিছুতেই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ইংরেজ আমল থেকে এ পর্যন্ত মাদরাসা-শিক্ষিত আলেম সমাজ কুরআন ও হাদীসকে বাঁচিয়ে রাখা এবং মুসলিম জনগণের ইসলামী চেতনা জাগ্রত রাখার ক্ষেত্রে যে বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন; সেজন্য আধুনিক শিক্ষিত সকলকে তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেননা তাঁরা না থাকলে বিয়ে পড়ানোর লোকও পাওয়া যেত না। উচ্চশিক্ষিতদের জানাযা-দাফন-কাফনও ইসলামী নিয়মে সম্ভব হতো না। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা কুরআন তিলাওয়াত ও নামায আদায় করেন তারাও মূলত ঐ আলেম সমাজের কাছে ঋণী। তাই আলেম সমাজের দীনী খিদমতকে নগণ্য মনে করা জঘন্য অপরাধ।



www.icsbook.info

## আমার দীনী জিন্দেগী গড়ার কাহিনী

আমার আব্বা আমার দাদার বড় ছেলে ছিলেন। তিনি ঐ মাদরাসা থেকেই আলিম হয়েছেন, যেখানে দাদা পড়েছেন ও পড়িয়েছেন। আমি দাদার বড় নাতি। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত বয়সকাল দাদার সুহবতেই কেটেছে। তাঁর সাথেই খেতাম, তাঁর হাত ধরেই মসজিদে যেতাম। তিনি আমাকে মুখে মুখে অনেক কিছুই শেখাতেন। দাদার ইন্তেকালের সময় আমার বয়স ছিল সাড়ে তেরো বছর। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে ওঠার পর আরবী শেখার জন্য নিউ স্কিম জুনিয়র মাদরাসার তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দূরে যেতে হলো। সেখানেও আমি একজন আদর্শ শিক্ষকের স্নেহধন্য হই।

আমার দাদা ঐ বয়সেই আমার অন্তরে এতটুকু ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আমাকে অনেক শিক্ষিত হতে হবে। বাংলা, আরবী ও ইংরেজি ভাষা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে হবে। রাসূল (স) যে শিক্ষা দিয়েছেন তা শিখতে হবে ও পালন করতে হবে, যাতে মরণের পর বেহেশতে যাওয়া যায়। দাদার শেখানো এসব কথা আমি ভুলিনি। তাই আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে কোনো বই কোথাও দেখলে পড়ে শেষ না করে ক্ষান্ত হতাম না। জুনিয়র মাদরাসায় আমার ঐ আদর্শ শিক্ষক 'শিয়াল পণ্ডিত' বই যেমন পড়তে দিয়েছেন, তেমনি 'নামায শিক্ষা' বইও দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কিত বই তখন খুব কমই ছিল। জুনিয়র মাদরাসার লাইব্রেরিতে যে ক'টি বই ছিল তা স্যার আমাকে পড়তে দিতেন।

৭ম শ্রেণীতে কুমিল্লা হোচ্ছামিয়া হাই মাদরাসায় ভর্তি হই। ৮ম শ্রেণীতে পড়ার সময় দশম শ্রেণীর একজন ধার্মিক ছাত্রের নিকট মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর লেখা বই ও ওয়াযের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র) কর্তৃক অনূদিত) পড়ার সুযোগ পাই।

দাদার সংস্পর্শে থেকে ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে বুঝতে শিখেছিলাম; মাওলানা থানভী (র)-এর লেখা পড়ে অনুভব করলাম যে, ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। তিনি কুরআন ও হাদীস উদ্ধৃত করে তা এমন চমৎকার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন যে, আমি দারুণভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই। তাঁর লেখায় নকলী ও আকলী দলিলের সমাবেশ আমাকে সেগুলো পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

১৯৪০ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ) নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে আমি অবিলম্বে চকবাজার মসজিদে মাওলানা থানভী (র)-এর রচনাবলির অনুবাদক মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এর সাথে যোগাযোগ করি। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। তাঁর জীবন থেকে আমি বহু কিছু শিখেছি। 'জীবনে যা দেখলাম'-এর প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি।



www.icsbook.info

## তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের অবদান

১৯৫০ সালের মার্চে এমএ পরীক্ষা দিয়েই তিন চিল্লা (৪ মাস) সময় এদেশে ও দিল্লীতে কাটাই। তাবলীগ জামায়াত আমার মধ্যে এ জযবা সৃষ্টি করল যে, ইসলাম এমন এক মহান ধর্ম যার প্রতি জনগণকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য গোটা জীবন উৎসর্গ করা কর্তব্য। ১৯৫২ সালে তমদ্দুন মজলিসে যোগদান করে জানতে পারলাম যে, ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়– এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকসহ জীবনের সকল দিক সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বিধান পাঠিয়েছেন, যা রাসূল (স) বাস্তবে চালু করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এ শিক্ষা আমি তাবলীগ জামায়াতে পাইনি। তাবলীগ জামায়াতে অনেক বড় বড় আলেমের বয়ান শুনেছি; কিন্তু এ জাতীয় কথা তো কখনো শুনিনি। এমনকি সেখানে কুরআন মাজীদ বোঝার কোনো তাগিদও কেউ দেননি।

তাবলীগ জামায়াতে ইসলামের ধর্মীয় দিক আমাকে এতটা আকৃষ্ট করেছিল যে, তমদ্দুন মজলিসের শিক্ষা তাবলীগে না থাকা সত্ত্বেও আমি তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের সাথে সমান গুরুত্বসহকারে কাজ করেছি। এমনকি রংপুরে আমি এ দুটোরই প্রতিষ্ঠাতা দায়িত্বশীল ছিলাম।

তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমেই আমি প্রথম মাওলানা মওদূদীর তিনটি বই পাই। দুটো ইংরেজিতে ও একটি বাংলায়। The Process of Islamic Revolution (ইসলামী বিপ্লবের পথ), The Political Theory of Islam (ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ) ও 'একমাত্র ধর্ম'– এ ক'টি বইয়ে ইসলামের যে খোরাক পেলাম তা আমার ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা আরো বৃদ্ধি করে দিল।

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে তখনো আমি কিছু জানতাম না। মাওলানা মওদূদীর লেখা বই পড়ে অত্যন্ত প্রেরণা লাভ করলাম বটে, কিন্তু তাঁর কোনো সংগঠন আছে বলে আমার জানা ছিল না। ১৯৫৪ সালে গাইবান্ধায় গিয়ে জানতে পারলাম যে, জামায়াতে ইসলামীই মাওলানা মওদূদীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন।

তমদ্দুন মজলিস ধর্মীয় অনুশাসন পালনের দিক দিয়ে অত্যন্ত ঢিলা মনে হতো বলেই তাবলীগ জামায়াতের আকর্ষণ আমার মন-জগজে অব্যাহত ছিল। জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে যখন আমার এই ধারণা হলো যে, এখানে ইসলামের সবদিকের প্রতিই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় তখন আমি তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিস ছেড়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। তবে আমি এখনো ঐ দুটো সংগঠনকে ভালোবাসি ও আমার জীবনে সংগঠন দুটির অবদানকেও স্বীকার করি।

## জামায়াতে ইসলামীতে এসে যা শিখলাম

বাপ-দাদার নিকট থেকে ইসলামকে ধর্ম হিসেবেই জানতাম। মাওলানা থানভী (র) থেকে শিখলাম, ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। তাবলীগ জামায়াতে এসে প্রেরণা



www.icsbook.info

পেলাম, ইসলাম ধর্মকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর তমদ্দুন মজলিসে এসে জানলাম, ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। আর জামায়াতে ইসলামীতে এসে উপলব্ধি করলাম যে, দীন ইসলাম আল্লাহর দেওয়া এমন এক জীবনবিধান, যা অন্য কোনো বিধানের অধীনে বেঁচে থাকতে পারে না। মানবরচিত সকল বিধানের উপর এ দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যেই রাসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে এবং যে-ই এ রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে তাকেও জান-মাল দিয়ে এ দীনকে বিজয়ী করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করতে হবে। তাই দীন ইসলাম শুধু ধর্ম বা মিশন নয়, মুভমেন্ট বা আন্দোলনও বটে।

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর ৪/৫টি সাপ্তাহিক বৈঠকে দারসে কুরআন শুনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। জানতে পাবলাম, রাসূল (স)-কে যে বিরাট দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তা পালনের জন্য, ধাপে ধাপে কুরআন মাজীদ কীভাবে তাঁকে পরিচালনা করেছে সে দৃষ্টিভঙ্গিতেই এ কুরআন মাজীদকে অধ্যয়ন করতে হবে। রাসূল (স)-এর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনের সাথে মিলিয়েই কুরআনকে বুঝতে হবে। রাসূলের জীবনই বাস্তব ও জীবন্ত কুরআন। রাসূলের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের কোন্ স্তরে কোন্ সূরা নাযিল হয়েছে তা না জানলে কুরআন সঠিকভাবে বোঝা যাবে না।

জনাব আবদুল খালেক-এর দারস থেকে জানা গেল, মাওলানা মওদূদী ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতেই 'তাফহীমুল কুরআন' নামক তাফসীর লিখেছেন। আমি এ তাফসীর পড়ার প্রয়োজনে উর্দু ভাষা শিখলাম। তাবলীগ জামায়াতে কাজ করার সময় সামান্য উর্দু শিখেছিলাম। এরপর সিরিয়াস হয়ে তাফসীর অধ্যয়ন করতে লাগলাম। ফলে কুরআন বোঝার প্রকৃত মজা পেলাম এবং এর প্রতি দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হলাম। তখনো এ তাফসীর বাংলায় অনুবাদ হয়নি।

মাওলানার বিরুদ্ধে লেখা বইগুলোর বক্তব্য যাচাই করার প্রয়োজনে ৭/৮ মাস ব্যাপক অধ্যয়ন করতে বাধ্য হই। পড়ার নেশা পেয়ে বসল। মানবজীবনের যত দিক রয়েছে সকল দিকের জন্য ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তা জানার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। হাকীকত সিরিজের ঈমান, ইসলাম, নামায-রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদ সম্পর্কে বইগুলো পড়ে মন আলোকিত ও পুলকিত হয়ে উঠল। এ সব বিষয়ের এমন গভীর ও হৃদয়গ্রাহী অর্থ এর আগে কখনো শুনিনি।

আলেম বংশে আমার জন্ম। আমার নানা-মামারাও আলেম ও পীর ছিলেন, তাই আলেম পরিবেশেই আমি বড় হয়েছি। আলেমদের হেদায়াতমতোই নামায-রোযা করেছি। কিন্তু এর হাকীকত বা তাৎপর্য এমন চমৎকারভাবে তাঁরা আমাকে শেখাননি। তাবলীগ জামায়াতে একটানা সাড়ে চার বছর কাজ করেছি। সেখানেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নামায-রোযার ফযিলত ছাড়া আর কোনো তাৎপর্য জানতে পারিনি।



www.icsbook.info

আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব বা দীনকে বিজয়ী করার কর্তব্য সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীতে এসেই একটা পরিষ্কার ধারণা পেলাম। ইসলামী শাসনতন্ত্র, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামী সরকারের কর্মসূচি, ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান ইত্যাদির কোনো ধারণাই মাওলানা মওদূদীর বই পড়ার আগে আমার অন্তরে সৃষ্টি হয়নি।

ইসলামী জীবনবিধান সম্পর্কে এই যে ব্যাপক ধারণা পেলাম তা আমাদের আলেম সমাজে যদি চালু থাকত তাহলে আমি আরো আগেই এ সম্পর্কে জানতে পারতাম। এ জাতীয় বই ইতঃপূর্বে কোথাও দেখিনি।

বিশ্বের বেশ ক'টি দেশে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সব দেশেই ইসলামী চিন্তাবিদ রয়েছেন। ঐ সব সম্মেলনে যেসব বড় বড় চিন্তাবিদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁরা মাওলানা মওদূদীকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে মর্যাদা দেন। আরব বিশ্বের আলেম সমাজে তিনি খুবই সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। তিনি জীবিত থাকাকালেই ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে বিখ্যাত 'বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার' লাভ করেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কমিটির তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

যাঁর তাফসীর ও ইসলামী সাহিত্য থেকে ইসলামী জীবনবিধানকে ব্যাপকভাবে জানার সুযোগ পেলাম তাঁর বিরুদ্ধে যারা বিরূপ মন্তব্য করেন তাদের সম্পর্কে আমার মনে ভালো ধারণা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। আলেম সমাজ থেকে ইসলামের এমন সুস্পষ্ট জ্ঞান আমি পাইনি। যাঁর কাছ থেকে সে জ্ঞান পেলাম তাঁকে তারা কেন মন্দ বলেন, আমি তা জানার চেষ্টা করেছি।

## কাওমী মাদরাসার আলেমগণের ভূমিকা

আমাদের দেশের কাওমী মাদরাসাগুলোকে দারুল উলুম দেওবন্দের শাখা বলা চলে। ওলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে কয়েকজন বড় ব্যক্তিত্ব মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে কঠোর ভাষায় কতক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁদেরকে বড় আলেম হিসেবে আমিও শ্রদ্ধা করি। আর কাওমী আলেমদের নিকট তাঁরা অত্যন্ত উচ্চমর্যাদার অধিকারী। উস্তাদ ও বুযুর্গ হিসেবে তাঁদেরকে তাঁরা শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসেন। তাঁদের মুখে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য জানার পর কাওমী আলেমগণ স্বাভাবিক কারণেই মাওলানা মওদূদীর বিরোধী। এ কারণেই কাওমী আলেমদেরকে আমি দোষ দিতে পারি না।

## তাঁদের প্রতি আমার দুটো আবেদন

১. আপনারা পাকিস্তানে গিয়ে ওলামায়ে দেওবন্দের নিকট জিজ্ঞেস করুন যে, তাঁরা জামায়াতে ইসলামীর সাথে আদর্শিক ঐক্য করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী হুকুমত কেমন করে চালাচ্ছেন?



www.icsbook.info

বাংলাদেশের চেয়ে ওলামায়ে দেওবন্দের সংখ্যা পাকিস্তানে বেশি। সেখানে আমাদের দেশের মতো আলিয়া মাদরাসা নেই। তাঁরা ৬ দলীয় ইসলামী ঐক্যজোটের (MMA) সভাপতির পদ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীরকে কেমন করে দিলেন? দেওবন্দের কয়েকজন বুযুর্গ ও আকাবের মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এমন বিরূপ মন্তব্য করা সত্ত্বেও জামায়াতের আমীরকে তারা নেতা মেনে নিলেন কেন? এটা তো শুধু রাজনৈতিক ঐক্যই নয়; একই সাথে দীনী ও আদর্শিক ঐক্য।

২. আপনারা যে বুযুর্গগণের মন্তব্যকে সঠিক মনে করে আছেন তাঁরা নবীর মতো নির্ভুল নন। তাঁদের ইজতিহাদী গলতী হতে পারে। অতএব তাঁরা ভুলের উর্ধ্বে নন। আপনারা মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীর ও অন্যান্য সাহিত্য পড়ে দেখুন। হয়তো বুযুর্গগণ মাওলানা মওদূদীর কোনো লেখা বুঝতে ভুল করেও থাকতে পারেন। আর কোনো কোনো কথা আপত্তিকর মনে হলেও মাওলানার সব সাহিত্যকেই পরিত্যাজ্য মনে করা তো উচিত নয়।

### একটা সত্য ঘটনা

প্রায় বিশ বছর আগের কথা। জামায়াতের একজন রুকন আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং পরিচয় দিলেন যে, তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়া থেকে পাস করেছেন।

তিনি বললেন, "আমার একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছাত্রদের সমাবেশে একটি বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর উন্নত ও সমৃদ্ধ আলোচনায় আমি এত মুগ্ধ হলাম যে, তিনি যেসব পয়েন্ট আলোচনা করেছেন তা আমি হুবহু নোট করে নিলাম।

মাদরাসা থেকে পাস করার পর আমি ঢাকায় এক মসজিদে ইমাম নিযুক্ত হলাম। মাদরাসায় পড়ার সময় তো মাওলানা মওদূদীর লেখা বই পড়া অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো বলে আমি তা পড়তে পারিনি। ঢাকায় আসার পর জামায়াতের এক লোক আমাকে ঐসব বই পড়তে দিলেন। খুব মজা পেলাম। আরো বই চেয়ে নিলাম এবং পড়তে থাকলাম। একটা বই পড়ে আমি চমকে উঠলাম। মাদরাসার উস্তাদের যে বক্তৃতা আমি সযত্নে নোট করেছিলাম তা হুবহু এ বইটির ভাষার সাথে মিলে গেল।

আমি কিশোরগঞ্জ গিয়ে হুযুরের সাথে দেখা করে বললাম, হুযুর এই বইটিতে যেভাবে পয়েন্ট সাজানো আছে আপনার বক্তৃতার নোটে ঠিক সেভাবেই সাজানো পেলাম। আপনি এ বই থেকে বক্তৃতা করেছেন বলে আমার ধারণা। হুযুর মাথা নত করে চুপ করে রইলেন। বললাম, আমাদেরকে যাঁর বই পড়তে আপনারা নিষেধ করেন তাঁর বই পড়ে বক্তৃতা করলেন। আপনাদের সম্পর্কে আমার ধারণা এখন কী হতে পারে?"



www.icsbook.info

## বড় বড় আলেমগণের রাজনৈতিক ভূমিকা কী ছিল?

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর আমার মনে এই বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি হলো যে, ১৯৪১ সালে যখন মাওলানা মওদূদী মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী কায়েম করেন তখন এ উপমহাদেশে অনেক বড় বড় আলেম ছিলেন। 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' নামে নিখিল ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের একটি সংগঠনও ছিল। প্রখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় আলেমগণ মাওলানা মওদূদীর চেয়ে বয়সে ও অভিজ্ঞতায় অনেক সিনিয়র ছিলেন। তাঁরা তো অনেক আগেই ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারতেন।

ঐ সময় রাজনৈতিক ময়দানে মি. গান্ধি ও মি. নেহরুর নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে বিপরীতমুখী দাবির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের পর ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে বলে বোঝা গেল। স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতার অধিকারী কারা হবে– সেটাই তখন সবচেয়ে বড় ইস্যু ছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ভারতবর্ষের ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস শাসন কায়েম হয়। এ ক'টি প্রদেশে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু। তিন বছরের প্রাদেশিক শাসনে কংগ্রেস, মুসলিমদের প্রতি যে আচরণ করেছিল তাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইংরেজরা চলে গেলে কংগ্রেস যখন কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হাতে নেবে তখন গোটা ভারতে মুসলমানদের সাথে কেমন আচরণ করবে! মুসলিম জাতি উপলব্ধি করল, ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও স্বাধীন ভারতবর্ষে মুসলমানরা অমুসলিমদের গোলাম হয়েই থাকবে। বর্তমান ভারতে মুসলমানদের অবস্থা ঐ আশঙ্কাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। এ কারণেই ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহকে ভারত থেকে পৃথক করে মুসলিমদের নিজস্ব রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে।

মুসলিম লীগের এ সিদ্ধান্তের ফলে রাজনৈতিক ময়দান স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। একদিকে কংগ্রেস তাদের ভারতমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করতে কিছুতেই সম্মত ছিল না, অপরদিকে মুসলিম লীগ 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', 'পাকিস্তান কা মতলব কেয়া–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শ্লোগানে মেতে উঠল।

কংগ্রেস দাবি করল, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-শিখ-উপজাতি সকলে একজাতি। আর মুসলিম লীগ দাবি করল, মুসলিমরা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। কংগ্রেসের একজাতি তত্ত্ব ও মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্ব চরম মতভেদের জন্ম দিল।

এ কঠিন পরিস্থিতিতে গোটা ভারতবর্ষের একমাত্র ওলামা সংগঠন 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' কংগ্রেসের মত সমর্থন করে বসল। সংগঠনের নেতা মাওলানা



www.icsbook.info

হোসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর লেখা, 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' পুস্তিকা মুসলমানদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল।

ফুরফুরার পীর সাহেবের উদ্যোগে ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' নামের সর্বভারতীয় সংগঠন পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) মুসলিম লীগকে সমর্থন করে পাকিস্তান আন্দোলনে শক্তি যোগালেন। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বিরোধিতা করে পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করায় দেওবন্দ মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষক সেখান থেকে বহিষ্কৃত হন— যাদের মধ্যে মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী ও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ঢাকা আরমানিটোলা ময়দানের একটি বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন। আমি তখন আইএ ক্লাসে পড়ি। ঐ সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আলেমগণের রাজনৈতিক ভূমিকা শুধু সমর্থক পর্যায়ের ছিল; তাঁরা নেতৃত্বের পর্যায়ে ছিলেন না। তাঁরা কংগ্রেস বা মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছেন মাত্র; নেতৃত্ব দিয়েছেন যারা, তারা অন্য লোক।

### ওলামায়ে কেরাম ইকামাতে দীনের আন্দোলন করেননি কেন?

এ প্রশ্নের জবাব তালাশ করে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ওলামায়ে কেরাম আজীবন দীনের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তাঁদের ছিল না। তাঁরা দীনের খাঁটি মুসলিম খাদিম ছিলেন— এ বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকলে তাঁরা অবশ্যই ইকামাতে দীনের জন্য সংগ্রাম করতেন। ১৯৫৩ সালে মাওলানা আতহার আলী ও মাওলানা সিদ্দীক আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যখন পাকিস্তানে ইসলামী নেযাম (সমাজব্যবস্থা) কায়েম করা জরুরি বলে উপলব্ধি করলেন তখন তাঁরা নেজামে ইসলাম পার্টি কায়েম করেন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টে শরীক হয়ে প্রাদেশিক আইন পরিষদে ২২টি আসনে জয়ী হন।

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেযজী হুযুর ১৯৮১ সালে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা ফরয হিসেবে বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর আগে তিনি রাজনীতি করা মোটেই পছন্দ করতেন না। শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হকও ঐ নির্বাচনের পরে হাফেযজী হুযুরের সাথে মিলে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে 'খেলাফত আন্দোলন' নামে সংগঠনভুক্ত হন। চরমোনাইর পীর সাহেব আশির দশকেই ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগঠন কায়েম করেন। মাওলানা মুফতী ফযলুল হক আমিনী মাত্র কয়েক বছর আগে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি কায়েম করেছেন।



www.icsbook.info

এতে বোঝা গেল যে, উপরিউক্ত ইসলামী নেতৃবৃন্দ যখন দীনকে বিজয়ী করার ফারযিয়াত সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন তখনই এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা শুরু করেছেন। গত ২০ বছর সময়কালে উপরিউক্ত ইসলামী সংগঠনগুলো কায়েম হয়েছে। ইসলাম তো এ দেশে দেড় হাজার বছর আগেই এসেছে। উপরিউক্ত আলেমগণও বহু বছর থেকেই দীনের খিদমত করছেন; কিন্তু ইকামাতে দীনের ফারযিয়াত সম্পর্কে পূর্বে তাঁদের কোনো চেতনা বা উপলব্ধি ছিল না। ওলামায়ে দেওবন্দের মাঝেও এ চেতনা জাগ্রত হলে নিশ্চয় তাঁরা ইকামাতে দীনের আন্দোলন করতেন।

ওলামায়ে কেরাম মাদরাসা ও খানকাহ'র কর্মসূচিতেই যদি দীন বিজয়ী হবে বলে মনে করতেন তাহলে শহীদাইনে বালাকোট শহীদ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী ও মাওলানা ইসমাইল শহীদ 'তাহরীকে মুজাহিদীন' তথা মুজাহিদ আন্দোলন করে ইসলামী হুকুমাত কায়েমের চেষ্টা করতেন না।

## ইকামাতে দীন ও খিদমতে দীন

দীন ইসলাম মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এটাও তারই মেহেরবানী যে, দীনের শিক্ষাকে জনগণের নিকট তুলে ধরার জন্য তিনি তাঁর হাজার হাজার বান্দাহকে অবিরাম চেষ্টায় লাগিয়ে রেখেছেন। এরই ফলে আমাদের দেশে এত মসজিদ, মাদরাসা, পীর, ওয়ায-নসীহত, তাফসীর মাহফিল ও তাবলীগের এত জামায়াত চালু আছে।

এ সবই দীনের বড় বড় খিদমত। এ দেশে প্রায় দু'শ বছর ইংরেজ কাফিরদের শাসন থাকা সত্ত্বেও ওলামা ও মাশায়েখের মেহনত ও কুরবানীর ফলে ঐ সব দীনী খিদমত বন্ধ হয়ে যায়নি; বরং বেড়েই চলেছে। বর্তমানে যাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা রয়েছে তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক, দীনের এ সব খিদমত বন্ধ করতে পারবেন না। আল্লাহর রহমতে এ সব খিদমত শত শত বছর থেকে চালু আছে। দীনের খাদিমগণের সংখ্যাও ইনশাআল্লাহ বাড়তেই থাকবে।

কিন্তু শুধু খিদমতে দীনের ফলে আল্লাহর দীন কায়েম হতে পারে না। অবশ্য এসব খিদমত দীন কায়েমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। মাদরাসায় ওলামা বাহিনী তৈরি হয়েছে বলেই এত বিরাট সংখ্যায় আলেমগণ ইকামাতে দীনের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারছেন। মসজিদ, খানকাহ, ওয়ায ও তাফসীর চালু থাকার ফলেই জনগণ আল্লাহকে বিশ্বাস করতে, রাসূল (স)-কে মহব্বত করতে এবং কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। ইকামাতে দীনের জন্য জনসমর্থন যোগাড় করতে এ সব খিদমত নিঃসন্দেহে বড় সহায়ক।



www.icsbook.info

## ইকামাতে দীন কি?

দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে পাঠিয়েছেন বলে কুরআন মাজীদে তিন বার উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা তাওবার ৩৩নং আয়াত, সূরা ফাত্‌হের ২৮নং আয়াত ও সূরা সাফ্‌ফের ৯নং আয়াত)। এ কাজটিই হলো ইকামাতে দীন। দীনকে বিজয়ী করা আর কায়েম করা একই কথা।

মানুষ যাতে দুনিয়ায় শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তি পায় সেজন্য রাসূল (স)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের গোটা জীবন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আইন-কানুন ও বিধি-বিধান পাঠিয়েছেন। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সকল দিকের জন্যই নিয়ম-কানুন দিয়েছেন। এরই নাম দীন ইসলাম।

রাসূল (স)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ নিজেদের মনগড়া আইন-কানুনের কারণে দুনিয়ায় যে অশান্তি ভোগ করছে, এ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য ঐ সব আইনের বদলে আল্লাহর আইন কায়েম করতে হবে। এ পৃথিবী আল্লাহর, এখানে তাঁরই আইন চলা উচিত। মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই আল্লাহর আইন কায়েম হওয়া জরুরি।

রাসূল (স) মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে এ মহান দায়িত্বই পালন করে গেছেন। এ কাজটিই হলো ইকামাতে দীন। যারা আল্লাহর বান্দাহ্ ও রাসূলের উম্মাত তাদের উপরও ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করা সব ফরযের বড় ফরয। সাহাবায়ে কেরাম এ মহান ফরয আদায়ে সব সময় রাসূল (স) এর সাথী বা সহকর্মী ছিলেন। সাহাবী মানেই সাথী।

## হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন?

দুনিয়ায় যত নবী ও রাসূল এসেছেন তাঁদের সবাই হক কায়েম করার দায়িত্বই পালন করে গেছেন। যে দেশে দীনে হক কায়েম ছিল না সেখানে অবশ্যই বাতিল কায়েম ছিল। হক কায়েমের চেষ্টা করলে বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা আসাই স্বাভাবিক। কারণ, হক ও বাতিল একই সাথে চালু থাকতে পারে না। আলো ও অন্ধকারের সহাবস্থান অসম্ভব। তাই যখনই কোনো নবী হকের দাওয়াত দিয়েছেন তখনই বাতিল তাতে বাধা দিয়েছে। একমাত্র আদম (আ) এবং সুলায়মান (আ) বাধার সম্মুখীন হননি। কারণ, আদম (আ)-এর সময় অন্য কোনো মানুষই ছিল না, বাধা দেবে কে? আর সুলায়মান (আ) তাঁর পিতা দাউদ (আ)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক ছিলেন বলে তাঁকে বাধা দেওয়ার মতো কোনো বাতিল শক্তি ছিলই না।

হকের আওয়ায যে কালেমায়ে তাইয়েবার মারফতে পয়লা ঘোষণা করা হয় তাতে আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করার পূর্বে 'লা ইলাহা' বলে সমস্ত বাতিলকে অস্বীকার করা হয়। সমাজে ইলাহ বা মনিব কিংবা হুকুমকর্তার দাবিদার বাতিল শক্তি



www.icsbook.info

কায়েম আছে বলেই পয়লা বাতিলকে অস্বীকার করার দরকার হয়। বাতিলকে মন-মগজে কায়েম রেখে হককে স্বীকার করা অর্থহীন। তাই পয়লা 'লা ইলাহা' বলে সমস্ত বাতিল ইলাহকে অস্বীকার করে 'ইল্লাল্লাহ' বলে একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "যে তাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, সে এমন মযবুত রশি ধরেছে, যা কখনো ছিঁড়বে না।" (সূরা বাকারা : ২৫৬)

তাগূত অর্থ হলো আল্লাহর বিদ্রোহী শক্তি। কাফের আল্লাহকে অস্বীকার করে মাত্র। কিন্তু তাগূত মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করে। ফেরাউন এমন ধরনের তাগূত ছিল বলেই মুসা (আ)-কে তার নিকট পাঠানোর সময় আল্লাহ বললেন, "ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহ করেছে।" (সূরা নাযিয়াত :১৭)

ইসলামবিরোধী শক্তি এক কথায় তাগূত। দীনে বাতিল তাগূতী শক্তিরই নাম। কালেমায়ে তাইয়েবায় প্রথমেই তাগূত বা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলা হয়, 'লা ইলাহা' বা কোনো হুকুমকর্তাকে মানি না। অন্য সকল কর্তা বা প্রভুকে অস্বীকার করার পরই 'ইল্লাল্লাহ' বলে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকার করা হয়। সুতরাং ইসলামের প্রথম কথাই হলো বাতিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ কারণেই কালেমার দাওয়াত নিয়ে যে নবীই এসেছেন, তাগূত বা বাতিল তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই দুশমন মনে করেছে।

আল্লাহ তাআলা যাঁদেরকে নবী ও রাসূল হিসেবে বাছাই করেছেন তাঁরা সবাই নবুওয়াত লাভের পূর্বে নিজ নিজ দেশে সৎ, বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও যাবতীয় মানবিক গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। দীনে হকের দাওয়াত দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শেষ নবীও 'আল-আমীন' ও 'আস-সাদেক' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু "আল্লাহর দাসত্ব কর ও তাগূতকে ত্যাগ কর।" (নাহল : ৩৬) এই দাওয়াত দেওয়ার পর নবীর সাথে তাগূতের সংঘর্ষ না বেঁধে পারে না।

নবীর দাওয়াত শুনেই নমরূদ, ফেরাউন ও আবু জেহেলরা বুঝতে পারল, তারা দেশকে যে আইনে শাসন করছে ও সমাজকে যে নীতিতে চালাচ্ছে, তা বদলিয়ে নবী নতুন কোনো ব্যবস্থা চালু করতে চান। ফেরাউন স্পষ্ট করে বলেই ফেলেছিল, "আমি আশঙ্কা করি যে, সে (মূসা) তোমাদের দীনকে বদলিয়ে দেবে।" (সূরা মু'মিন : ২৬)

যারা দেশ শাসন করে তারা আইন-কানুন এমনভাবেই বানায়, যাতে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ বহাল থাকে। জনগণকে শোষণ করে শাসকগোষ্ঠীর প্রাধান্য বজায় রাখার উপযোগী আইন ও অর্থব্যবস্থা সমাজে চালু রাখা হয়। মানবরচিত আইনের বৈশিষ্ট্যই



www.icsbook.info

এটা। সুতরাং প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বহাল রাখার মধ্যেই শাসকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে। এ জন্যেই এদেরকে কায়েমী স্বার্থ বলা হয়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবস্থা বহাল থাকলে যাদের স্বার্থ কায়েম থাকে তারাই কায়েমী স্বার্থ (Vested Interest)।

যখনই কোনো নবী আল্লাহর দাসত্বের দাওয়াত দিয়েছেন তখনই কায়েমী স্বার্থ এটাকে তাদের স্বার্থবিরোধী বলে বুঝতে পেরেছে। সে কারণেই তারা এটাকে বাধা দেওয়া জরুরি মনে করেছে। শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই নয়, সামাজিক ও বাতিল ধর্মীয় স্বার্থও নবীদেরকে সহ্য করতে পারেনি। ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন। নমরুদের দরবারে তার রাজ-পুরোহিতের মর্যাদা ছিল। ধর্মের ব্যবসা নিয়ে নমরুদের অধীনে তিনি সুখেই ছিলেন। ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতের ফলে আযরের ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগল। শেষ নবী আশা করেছিলেন, ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওলামা ও পীরগণ (কুরআনের ভাষায় আহ্‌বার ও রুহবান) হয়তো তাঁর দাওয়াত সহজেই কবুল করবে। কারণ আল্লাহ, আখিরাত, নবী ও ওহী ইত্যাদির সাথে তারা আগে থেকেই পরিচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, রাসূল (স)-এর সাথে যখন মক্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ বাধল তখন ঐ আহ্‌বার ও রুহবানদের ধর্মীয় স্বার্থই তাদেরকে আবু জেহেলদের সহযোগিতা করতে বাধ্য করল। এভাবেই হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অবশ্যই অনিবার্য এবং হকের বিরুদ্ধে সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থ একজোট হয়েই সব সময় তার বিরোধিতা করে থাকে।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, মুসলিমপ্রধান দেশে মুসলিম শাসকদের সাথে ইসলামী আন্দোলনের এ ধরনের বিরোধ হওয়ার কারণ কী? মুসলিম নামধারী হলেই কেউ সত্যিকার ইসলামপন্থি হয়ে যায় না। ইয়াযীদ মুসলিম শাসকই ছিল। কিন্তু ইসলামী আদর্শের ধারক ইমাম হুসাইন (রা)-কে ইয়াযীদ সহ্য করতে পারেনি। এ দেশে মুসলিম নামধারী নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট বহু নেতা ও দল আছে, যারা ইসলামী আন্দোলনের চরম দুশমন।

আসল ব্যাপার হলো কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা। যারা কোনো দিক দিয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সুবিধা ভোগ করছে তারা যখন বুঝতে পারে যে, ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হলে যে ধরনের আইন-কানুন ও সমাজব্যবস্থা চালু হবে তাতে তাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। তাই তারা এ আন্দোলনের শত্রুতে পরিণত হয়।

যে বাতিল শক্তি দীনে হক কায়েমের পথে বাধার সৃষ্টি করে তা দু'ধরনের হয়ে থাকে। প্রধান বাতিল শক্তি হলো ক্ষমতাসীন সরকারি শক্তি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা ইকামাতে দীনের আন্দোলনকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। অনৈসলামী সমাজে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দলের নেতৃত্বে ইসলামী সমাজব্যবস্থা যে চালু হতে পারে না সে কথা সবাই ভালোভাবেই জানে। ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের নেতৃত্ব



www.icsbook.info

বহাল থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে থাকে।

সমাজে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী অপর শক্তি হচ্ছে তারা, যারা সরাসরি বাতিল শক্তির মধ্যে গণ্য না হলেও হক ও বাতিলের সংঘর্ষে হকের পক্ষে সক্রিয় হয় না। এতে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাতিলকেই সহযোগিতা করে। বাতিলের বিরুদ্ধে ময়দানে যারা সক্রিয় নয় তারা ঐ সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। এমনকি দীনের খাদিম হয়েও তারা এ জাতীয় দু'মুখো ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করার হিম্মত যাদের নেই তারা একপর্যায়ে বাতিলেরই সহায়ক প্রমাণিত হয়।

## দীনী খিদমতের সাথে এ সংঘর্ষ হয় না কেন?

যে দেশে দীনে হক কায়েম নেই সেখানে ইকামাতে দীনের কাজ বা ইসলামী আন্দোলন চালালে তাতে কায়েমী স্বার্থ অবশ্যই বাধা দেবে। ইসলামী আন্দোলনকে বাতিল শক্তির জন্য ক্ষতিকর ও আপত্তিকর মনে করাই স্বাভাবিক। যদি কায়েমী স্বার্থ কোনো ইসলামী খিদমতকে বিপজ্জনক মনে না করে তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ খিদমত যতই মূল্যবান হোক, তা ইকামাতে দীনের আন্দোলন নয়।

মাদরাসাসমূহ নিঃসন্দেহে দীনের বিরাট খিদমত করছে। কিন্তু মাদরাসায় যে দাওয়াতী কর্মসূচি রয়েছে তা বাতিল সরকার ও সমাজব্যবস্থাকে উৎখাত করবে বলে কায়েমী স্বার্থ মনে করে না। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাদরাসা ভারতের দেওবন্দে অবস্থিত। কিন্তু ভারত সরকার ঐ মাদরাসাকে সে দেশের আইন, শাসন ও সরকারের জন্য মোটেই ক্ষতিকর মনে করে না। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে দেওবন্দ মাদরাসার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক বিরাট আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঐ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ইন্দিরা সরকার দেওবন্দ মাদরাসার দাওয়াত ও কর্মসূচিকে সে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য মোটেই ক্ষতিকারক মনে করেননি।

দীনের বিরাট খিদমতের জন্য দেওবন্দ মাদরাসাসহ আমাদের ছোট-বড় সব মাদরাসার নিকটই মুসলিম জাতি কৃতজ্ঞ। এ খিদমতের গুরুত্ব তারা কখনো অস্বীকার করতে পারে না। এ সব মাদরাসা নিশ্চয়ই ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক। আন্দোলনের যোগ্য বহু আলেম এ সব মাদরাসা থেকে এসেছেন। কিন্তু মাদরাসাগুলো প্রত্যক্ষভাবে ইকামাতে দীনের কোনো আন্দোলন চালাচ্ছে না।

তেমনিভাবে তাবলীগ জামায়াতও দীনের খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। এ জামায়াত সারা দুনিয়ায়ই বিপুলসংখ্যক লোককে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতমুখী বানাচ্ছে। এ জামায়াতের কেন্দ্র ভারতের দিল্লীতে অবস্থিত। এ বিশ্ব জামায়াতের আমীরও ভারতের



www.icsbook.info

নাগরিক। কিন্তু এ জামায়াতকে কোনো দেশের সরকারই তাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করে না। এমনকি চীন ও রাশিয়াতে পর্যন্ত এ জামায়াতকে যেতে বাধা দেওয়া হয় না। এ মহান জামায়াতের উসিলায় কমিউনিস্ট দেশেও কালেমা-নামাযের পয়গাম এবং আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের দাওয়াত পৌঁছতে পারছে। এটা খুবই আনন্দের কথা। এটাকে ছোট খিদমত মনে করা অন্যায়।

কিন্তু তাবলীগের দ্বারা যত বড় দীনী খেতমতই হোক, এ জামায়াতের দাওয়াত ও কর্মসূচিতে ইকামাতে দীনের কোনো পরিকল্পনা নেই। মুসলিম সংখ্যালঘু দেশ, এমনকি কমিউনিস্ট দেশেও এ জামায়াতকে কাজ করতে হচ্ছে। সুতরাং বতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে দীনের খিদমত করার যতটুকু সুযোগ নেওয়া সম্ভব ততটুকুই এ জামায়াত নিচ্ছে।

সাড়ে চার বছর মনপ্রাণ লাগিয়ে এ জামায়াতে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এমএ পরীক্ষা দিয়েই তিন চিল্লায় (চার মাস) একটানা এ জামায়াতের সাথে থাকাকালেই নিজের জীবনকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করার জযবা ও প্রেরণা বোধ করি। সুতরাং আমার জীবনে তাবলীগ জামায়াতের বিরাট অবদানকে আমি কখনোই ভুলব না। এ কারণেই তাবলীগ জামায়াতের সাথে আমার মহব্বত স্বাভাবিকভাবেই গভীর ও স্থায়ী।

বাংলাদেশের তাবলীগ জামায়াতের নেতৃস্থানীয় সবাইকে আমি অন্তর থেকে মহব্বত করি। কারণ, এক সাথে কয়েক বছর এক জামায়াতে কাজ করার দরুণ ব্যক্তিগতভাবে তাদের ইখলাস ও একাগ্রতা সম্পর্কে আমার সঠিক ধারণা হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের কাউকে আমি অন্তরে উস্তাদ হিসেবে শ্রদ্ধা করি। যেমন– মরহুম মাওলানা আব্দুল আযীয, সাবেক আমীর, তাবলীগ জামায়াত বাংলাদেশ। তাদের কেউ কেউ আমার শ্রদ্ধাভাজন দীনী মুরব্বী, যাঁদের কাছ থেকে ইসলামের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করার প্রেরণা আমি পেয়েছি। যেমন– মরহুম ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মুকীত। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বেশ কয়েকজন এমন আছেন, যাঁদেরকে আমি ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও মহব্বতের বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম।

আমার ঐসব উস্তাদ, মুরব্বী ও বন্ধুদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তাদের খিদমতে অত্যন্ত দরদের সাথে আকুল আবেদন জানাই, তারা যেন এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, যাতে তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত এ মহান জামায়াত সম্পর্কে এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে কেউ কোনো ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে না পারে। কেউ কেউ তাবলীগ জামায়াতের কাজকে হুবহু রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন বলে প্রচার করে থাকেন। বর্তমানকালের মাদরাসাগুলোতে কুরআন ও হাদীসেরই শিক্ষা হচ্ছে। তাই বলে কেউ যদি মনে করেন যে, রাসূল (স) এ ধরনের



www.icsbook.info

মাদরাসাই কায়েম করেছিলেন, তাহলে এটা ভুল হবে। ঠিক তেমনি তাবলীগ জামায়াতের কাজ দ্বারা দীনের বড় খিদমত হওয়া সত্ত্বেও এ ধারণা সৃষ্টি হতে দেওয়া উচিত নয় যে, ঠিক এতটুকু কর্মসূচি নিয়েই রাসূল (স) ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

দীন ইসলামকে বিজয়ী করার যে কঠিন ও সংগ্রামমুখর আন্দোলন আল্লাহর রাসূল (স) পরিচালনা করেছিলেন এবং যে কর্মসূচি নিয়ে তিনি দীনকে বাস্তবে কায়েম করেছিলেন, ঠিক সে আন্দোলন এবং কর্মসূচিই যদি তাবলীগ জামায়াত গ্রহণ করত তাহলে বিনা বাধায় এবং বাতিলের সাথে কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই তারা এভাবে সব দেশে তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতেন না। দুনিয়াময় দীনের বুনিয়াদী শিক্ষাকে পৌঁছানোর প্রাথমিক কর্তব্য পালনের যে কর্মসূচি এ জামায়াত গ্রহণ করেছে তাতে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে হলে বর্তমান কর্মসূচিই সঠিক। কিন্তু আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী ও কায়েম করার জন্য এটুকু কর্মসূচি যে কোনোক্রমেই যথেষ্ট নয়, সে কথা সবারই বুঝতে হবে। যদি এটুকু দাওয়াত ও কর্মসূচিকেই রাসূল (স)-এর আন্দোলন বলে মনে করা হয়, তাহলে এ জামায়াত দ্বারা দীনের যে পরিমাণ খিদমত হচ্ছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ক্ষতি হওয়ারই আশঙ্কা রয়েছে। যাদের মধ্যে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তাদের আচরণ থেকেই এ ক্ষতির ধরন ও পরিমাণ সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

### কয়েকটি ভুল ধারণা

যারা তাবলীগ জামায়াতের ছয় উসূলবিশিষ্ট কর্মপদ্ধতিকে (তরীকাকে) রাসূল (স)-এর মক্কী জীবনের দীনী দাওয়াতের কর্মসূচির অনুরূপ বলে মনে করেন এবং এটুকু কাজের মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম হয়ে যাবে বলে আশা করেন, তাদের মধ্যে কয়েকটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন–

১ তারা ইসলামকে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ মনে করবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তার কোনো প্রয়োজনীয়তাই তারা অনুধাবন করবে না। ইসলামী অর্থনীতি, আইন ও রাজনীতি তাদের নিকট অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলেই মনে হবে।

২. ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সরকার কায়েমের আন্দোলনকে তারা কেবল দুনিয়াদারী কাজ মনে করবে এবং যারা এ কাজ করে তাদেরকে ক্ষমতালোভী বলেই ধারণা করবে।

৩. বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে দীন কায়েমের এই ধারণা তাদের মধ্যে এমন মনোভাব সৃষ্টি করবে যে, বাতিল শক্তি ইসলামের যতটুকুতে আপত্তি করে না ততটুকু ইসলাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।



www.icsbook.info

৪. এ ধারণার ফলে দীনের অন্য যত প্রকার খিদমত আছে তারা সেগুলোকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। শুধু তাবলীগই তাদের কাছে দীনের কাজ বলে মনে হবে এবং অন্যান্য দীনী খিদমতের মূল্য বোঝার যোগ্যতাই তাদের থাকবে না।

৫. নির্বাচনের সময় এ জাতীয় লোকেরা ইসলামবিরোধী লোককে ভোট দিতেও আপত্তি করবে না; বরং ইসলামী আইন চালু করার দাবিতে যারা রাজনীতি করে তাদেরকে তারা অপছন্দ করবে। ইসলামের নামে রাজনীতি করাকে তারা দূষণীয় মনে করার কারণে ভোটের বেলায় তারা ঐ সব লোককেই ভোট দেবে, যারা ইসলামের কথা কখনো বলে না।

৬. তাদের এ ধারণাও হতে পারে যে, তাবলীগপন্থিরা এমন সুন্দর কৌশলে দীন ইসলামকে কায়েম করার চেষ্টা করছে যে, ইসলামের দুশমনরা তা টেরই পাচ্ছে না। এই জামায়াত এমন চমৎকার হেকমতের সাথে ধর্মীয় কাজ করছে যে, ইসলামবিরোধীরা তাতে বাধা দেওয়ার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছে না।

এ রকম ধারণা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা কি নবীদেরকে এমন খিদমত শেখাতে পারলেন না, যাতে তারা তাবলীগের মতো বিনা বাধায় কাজ করতে পারতেন। নবীগণ কি তাহলে এত যুলুম-নির্যাতন অনর্থকই সহ্য করেছেন?

কেউ বলতে পারেন যে, নবীগণ কাফেরদের মধ্যে দাওয়াত দিচ্ছিলেন বলেই বাধা পেয়েছেন। আর তাবলীগ মুসলমানদের মধ্যেই কাজ করছে বলে কোনো বাধা পাচ্ছে না। আর মুসলমানদেরকে ব্যক্তিগতভাবে ভালো মুসলমান বানানোর চেষ্টা করলে বাতিল থেকে বাধা আসবে কেন? কিন্তু দেশের আইন, শাসন ও সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের দাওয়াত ও কর্মসূচি নিয়ে কাজ করলে মুসলিম নামধারী শাসক শক্তিও অমুসলিমদের মতোই তাতে বাধা দেবে।

এসব আশঙ্কার কারণেই তাবলীগ জামায়াতের দায়িত্বশীলদের খিদমতে এত কথা আরজ করতে বাধ্য হলাম। তাবলীগ জামায়াত ইকামাতে দীনের আন্দোলন নয়। এ জামায়াত দীনের মহামূল্যবান খিদমতের এক বিশ্বজোড়া আন্দোলন। তাবলীগ সম্পর্কে এ ধারণাই আমি সঠিক বলে মনে করি। তাবলীগের দাওয়াত ও কর্মসূচিকে রাসূল (স)-এর ইসলামী আন্দোলনের মতোই পূর্ণাঙ্গ বলে ধারণা করলে সে ধারণা হবে আল্লাহপ্রদত্ত ইসলামী জীবনবিধানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এর ফলে বিশ্বনবীকে মাত্র একজন তথাকথিত ধর্মীয় নেতা হিসেবেই মনে করা হবে। আল্লাহ তাআলা এ জাতীয় ভুল ধারণা থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করুন।

প্রতি বছর তাবলীগের যে বিরাট বিশ্ব ইজতেমা টঙ্গীর বিস্তীর্ণ এক ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে লাখ লাখ লোকের সমাগম হয়। এটা সত্যিই উৎসাহের ব্যাপার। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের প্রতি মহব্বতের এ দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।



www.icsbook.info

দীনে বাতিলকে উৎখাত করে দীনে হককে কায়েম করার দাওয়াত ও কর্মসূচি নিয়ে যদি এর শতভাগের একভাগ লোকও একত্রিত হয় তাহলে দেশের সরকার ও কায়েমী স্বার্থ অস্থির হয়ে পড়ে। আর ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী মহল তো পত্র-পত্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হৈ চৈ শুরু করে দেয়।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ইসলামী ছাত্রসংগঠনের মাত্র ১৫/২০ হাজার কর্মীর একটি সম্মেলন ও মিছিল সমস্ত ইসলামবিরোধী মহলে এক অদ্ভুত কম্পনের সৃষ্টি করেছিল। অথচ ঐ সংগঠনটি কোনো রাজনৈতিক দল নয়। তারা ইকামাতে দীনের কথা বলে এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে বলেই কায়েমী স্বার্থ ও বাতিল শক্তিগুলো তাদের কর্মসূচিতে এত বিচলিত।

সকল বাতিল শক্তি ও ইসলামবিরোধী মহল ভালো করেই জানে যে, তাবলীগ নিছক ও নির্ভেজাল একটি ধর্মীয় জামায়াত এবং রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সরকার নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না। সুতরাং তাদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার কোনো কারণ নেই এবং ঘাবড়ানোরও কোনো হেতু নেই।

ঠিক একই কারণে পীর সাহেবানদের উরছ ও মাহফিলে লাখ লাখ মুসলমানের সমাবেশকে বাতিল শক্তি ভয় পায় না। এসব মাহফিলে ওয়ায, তালকীন ও যিকর-মারফত ইসলামের খিদমত নিশ্চয়ই হচ্ছে। কিন্তু সেখানে ইকামাতে দীনের কোনো কর্মসূচি না থাকায় ইসলামবিরোধী মহল তাদেরকে নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়।

এ কথাটা পরিষ্কার করার জন্যই উদাহরণস্বরূপ এখানে মাদরাসা, তাবলীগ ও খানকাহর কথা উল্লেখ করলাম। খিদমতে দীনের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয় না। একমাত্র ইকামাতে দীনের দাওয়াত ও প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেই এ সংঘর্ষ বাঁধে। সব নবীর জীবনেই এ কথা সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

কুরআন মাজীদে যত নবী ও রাসূলের কথা আলোচনা করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, সমকালীন ক্ষমতাসীন শক্তি ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ কোনো নবীকেই বরদাশত করতে পারেনি। শুধু হযরত আদম (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) ছাড়া অন্য সব নবী (আ)-এর সাথেই বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে। ইকামাতে দীনের কর্মসূচি নিয়ে কাজ করায় যদি নবীদেরকেই বাতিলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় তাহলে নবীর উম্মাতের পক্ষে এ সংঘর্ষ এড়িয়ে ইসলামকে কায়েম করা কী করে সম্ভব হতে পারে? আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যারা কাজ করতে চান তাঁরা এ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার কথা ভাবতেই পারেন না।

যারা বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলাকে হেকমত মনে করেন তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে ঐ হেকমতটা কেন শেখালেন না?



www.icsbook.info

তাঁরা দীনের কোনো না কোনো দিকের খিদমত অবশ্যই করতে পারেন এবং তাঁদের সেই খিদমত ইকামাতে দীনের সহায়কও হতে পারে। কিন্তু তাঁদের ঐ কাজটুকু প্রত্যক্ষভাবে ইকামাতে দীনের কাজ হতে পারে না। তাঁদের ঐটুকু খিদমত দ্বারা দীন কায়েম হয়ে যাবে না। দীন কায়েমের জন্য আলাদা কর্মসূচি অবশ্যই প্রয়োজন।

## জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব

ইকামাতে দীনের কাজ কারো পক্ষে একা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমনকি শত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনো নবী পর্যন্ত দীনকে একাকী বিজয়ী করতে পারেননি। অবশ্য প্রথমে নবীকে একাকীই কাজ শুরু করতে হয়েছে। যে নবীর ডাকে মানুষ সাড়া দেয়নি এবং জামায়াতবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ যে নবী পাননি, তিনি দীনকে বিজয়ী করতে পারেননি।

একটি সমাজব্যবস্থাকে বদলিয়ে নতুন করে তা গড়ে তোলার কাজটি এমন কঠিন ও জটিল যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক একদল লোকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এ বিরাট উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। তাই প্রত্যেক নবী মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব কবুলের দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে তাঁর আনুগত্য করে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালনে তাঁর সাথী হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন যে, "আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।" (সূরা শুআরা : ১০৮)

প্রত্যেক নবীই দীনের এ দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ, একদল লোকের আনুগত্য না পেলে দীনকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়। এ কারণেই ইসলামে জামায়াতের গুরুত্ব এত বেশি। জামায়াতের সাথে রোজ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে জামায়াতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এমনকি জামায়াতবদ্ধ যিন্দেগীকে ইসলামে আনুগত্যের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, "মেষের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন মেষকে যেমন নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে যায়, তেমনি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে শয়তান নিজের খপ্পরে নিয়ে যায়।"

এমনকি সফরের সময় দু'জন একসাথে সফর করলেও একজনকে আমীর মেনে নিয়ে জামায়াতের শৃঙ্খলা অনুযায়ী চলার জন্য রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন। জামায়াত ছাড়া ইসলামী যিন্দেগী সম্ভব নয় এবং আমীর ছাড়া জামায়াত গঠিত হতে পারে না। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসলিম হয় আমীর (হুকুমকর্তা) হবে, না হয় মামুর (হুকুম পালনকারী) হবে। যেমন– জামায়াতে নামায আদায় করা অবস্থায় তাকে হয় ইমাম হতে হবে, না হয় মুক্তাদী। কেউ যদি ইমাম বা মুক্তাদীর কোনোটাই না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সে নামাযের জামায়াতে শামিল হয়নি।


www.icsbook.info

তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো দীনী জামায়াতে শামিল হয়নি, সে সঠিক ইসলামী জীবনযাপনের কর্মসূচি গ্রহণই করেনি। এ অবস্থায় সে নাফ্স ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না।

নবী করীম (স)-এর সময়ে শুধু তাঁরাই মুসলিম বলে গণ্য হতেন, যাঁরা নবীর জামায়াতে শরীক হয়ে নবীর নিকট বা তাঁর প্রতিনিধির নিকট বাইয়াত করতেন। ঐ জামায়াতের বাইরে থাকলে কেউ মুসলিম বলে গণ্যই হতো না। ঐ জামায়াতই দীনের একমাত্র জামায়াত বা আল-জামায়াত ছিল। বর্তমানে কোনো একটি জামায়াতই আল-জামায়াতের মর্যাদা পেতে পারে না। রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে যত জামায়াত গঠিত হতে পারে সেসব জামায়াত মিলে আল-জামায়াত হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো দীনী জামায়াতে শামিলই হয়নি, সে ঈমানের দিক দিয়ে মোটেই নিরাপদ অবস্থানে নেই।

## জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান

বাংলাদেশ অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামী ১৯৫০ সাল থেকে সাংগঠনিকভাবে কাজের সূচনা করে এবং ১৯৫৬ সালে মাওলানা মওদূদীর প্রথম সফরের পর এখানে জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠে। ১৯৫৩ সালে নেজামে ইসলাম পার্টি গঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টিই এদেশে সবচেয়ে পুরনো ইসলামী দল। আশির দশক থেকে আরও কতক ইসলামী দল ময়দানে সক্রিয় রয়েছে।

দেশের ইসলামবিরোধী শক্তি, ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থি– সবাই জামায়াতে ইসলামীকে তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক মনে করে। জামায়াতের অগ্রগতি ঠেকানোর উদ্দেশ্যে তারা পরিকল্পিতভাবে বিদেশে এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী চারদলীয় জোট সরকারে শরীক থাকায় তারা দেশে ও বিদেশে মৌলবাদী, জঙ্গীবাদী ও তালেবানী সরকার বলে এ সরকারকে উৎখাতের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর উপর এই বলে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, মৌলবাদী ও তালেবানী সরকারের দুর্নাম থেকে বাঁচতে হলে মন্ত্রিসভা থেকে জামায়াতকে বের করে দিতে হবে। জামায়াতের কারণে চারদলীয় জোট সরকার দুনিয়ায় নিন্দিত হচ্ছে বলে বিএনপিকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন থাকাকালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ঢাকা এসেছিলেন। তখন তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় রচিত একটি পুস্তিকায় বলা হয়, বাংলাদেশে মৌলবাদী সন্ত্রাসী শক্তি এতটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে যে, সে কারণে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সাভার স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কর্মসূচি পর্যন্ত বাতিল করে দেন।



www.icsbook.info

ধর্মনিরপেক্ষ, ভারতপন্থি ও ইসলামবিরোধী সকল পত্রিকা একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই সকল জঙ্গীবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষক বলে জোর প্রচারণা চালাচ্ছে। কাদিয়ানীদের আস্তানায় যত হামলা হয়েছে সেগুলোর জন্য জামায়াতকে দায়ী করা হয়। তারা জামায়াতের উপর এত ক্ষ্যাপা কেন? আর অন্য কোনো ইসলামী দলের বিরুদ্ধে তারা এমন খড়গহস্ত নয় কেন?

জামায়াতকে নিয়ে তাদের এত মাথাব্যথার কারণ কী? বাংলাদেশে জামায়াতের অবস্থান সম্পর্কে তো তারা সম্যক অবহিত। তারা দেখতেই পাচ্ছে যে—

১. বাংলাদেশে জামায়াতের গণভিত্তি আছে।

২. নির্বাচনে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও ১৯৯১ সালে এ দলটি ১৮টি আসনে বিজয় লাভ করেছিল।

৩. সারা দেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও জামায়াতের সংগঠন সম্প্রসারিত।

৪. ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী ক্যাডারভিত্তিক লোক তৈরি করায় সর্বস্তরেই মযবুত সংগঠন রয়েছে।

৫. আধুনিক শিক্ষিত মহলে ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম মনে করা হতো। গত ৫০ বছরে জামায়াতে ইসলামীর প্রচেষ্টায় ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (Complete code of life)— এ ধারণা ক্রমেই প্রসার লাভ করছে।

৬. জামায়াতের প্রচেষ্টায় ইসলাম সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিতদের উপযোগী আকর্ষণীয় ও যুক্তিপূর্ণ বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে; যার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকসহ ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে।

৭. মাওলানা মওদূদী রচিত কুরআনের তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' শিক্ষিত মহলে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

৮. কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝেও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯. ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশার লোকেরা তাদের পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের মন-মগজ-চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রেরণা পাচ্ছেন।

১০. কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট সংখ্যক ছাত্র নিজেদেরকে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ করছে। ধর্মনিরপেক্ষ ও সন্ত্রাসী ছাত্রসংগঠনগুলোর হাতে এদের শতাধিক নেতা-কর্মী নিহত হওয়া সত্ত্বেও তারা ময়দানে টিকে আছে। নতুন প্রজন্মের আধুনিক শিক্ষিতদেরকে এত বিরাট সংখ্যায় ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে জান কুরবান করার জন্য প্রস্তুত হতে দেখে ইসলামের দুশমনদের মাথা ঠিক থাকার কথা নয়।



www.icsbook.info

ইসলামী শক্তির এ উত্থানে ইসলামবিরোধীদের আতঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির ছাড়া অন্য কোনো ইসলামী সংগঠনের বিরুদ্ধে তাদেরকে সামান্যতম সক্রিয় হতেও দেখা যায় না। যদি তারা আর কোনো ইসলামী সংগঠনের মধ্যে ঐ জাতীয় আতঙ্কের সম্ভাবনা দেখতে পায় তাহলে অবশ্যই সেগুলোর বিরুদ্ধেও তেমনিভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দুশমনরা বাংলাদেশে ইসলামী শক্তি হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকেই তাদের জন্য হুমকির কারণ মনে করে।

## জামায়াতের সাথে কোনো কোনো ইসলামী দলের আচরণ

একটি দলের নেতা বলে থাকেন, "জামায়াতে ইসলামী কোনো ইসলামী দলই নয়"। তিনি কেন এমন আজব কথা বল্লেন তা তিনিই ভালো জানেন। ইসলামবিরোধী পত্রিকাগুলো তার এ কথা ফলাও করে প্রকাশ করে। তার কথাকে ঐ সব পত্রিকা এত মূল্যবান বলে মনে করে কেন? কারণ, তারা জামায়াতে ইসলামীকেই প্রধান ইসলামী দল বলে মনে করে এবং এ কারণেই তারা এর অগ্রগতিতে শঙ্কিত। তারা ঐ নেতার এসব বক্তব্যকে ইসলামবিরোধীদের পক্ষে সহায়ক হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ বক্তব্য দ্বারা তিনি ইসলামের খিদমত করলেন, নাকি ইসলামের দুশমনদেরকে সাহায্য করলেন? তার ঐ বক্তব্য সম্পর্কে আমরা আর কোনো মন্তব্য করতে চাই না। তিনি একতরফাই জামায়াতের বিরুদ্ধে বলে চোচ্ছেন। জামায়াত তার বা তার দলের বিরুদ্ধে সামান্য মন্তব্যও করে না।

আর একটি দলের নেতা জামায়াতের সাথে গায়েপড়ে ঝগড়া করতে চান। জামায়াত কিন্তু তার সাথে ঝগড়া করতে চায় না। গত এপ্রিল মাসে (২০০৫) তিনি যা করলেন তা বিস্ময়কর। ঢাকা বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলন উপলক্ষে পল্টন ময়দান ব্যবহারের জন্য অনুমতি চেয়ে জামায়াতে ইসলামী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত দেয়। ২৯ এপ্রিল সম্মেলনের জন্য বিশাল প্যান্ডেল তৈরি করার প্রয়োজনে ২৮ এপ্রিলের জন্যও ময়দান ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হয়।

২৮ এপ্রিল তারিখে তাঁর দলের নাকি সম্মেলন হওয়ার কথা। তিনি যদি কর্তৃপক্ষের নিকট আগে দরখাস্ত করতেন তাহলে আগেই অনুমতি পেতেন। কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় ঘোষণা করল, জামায়াত আগে দরখাস্ত করেছে। ২৮ তারিখ জামায়াতের সম্মেলন ছিল না। তিনি জামায়াতের সাথে যোগাযোগ করলে অতি সহজেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তিনি তা না করে এর মধ্য থেকে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পেলেন। রীতিমতো হুমকি দিয়ে তিনি বললেন, ২৮ তারিখে অবশ্যই সম্মেলন করবেন। প্রয়োজনে রক্তগঙ্গা বইবে, কারবালার ঘটনাও ঘটতে পারে। জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হলো, জামায়াতের তৈরি প্যান্ডেলেই ২৮ তারিখে তিনি সমাবেশ



www.icsbook.info

করতে পারবেন। তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন। জামায়াত সমস্যায় পড়ে গেল। পরদিন সম্মেলন করার প্রয়োজনেই আগের দিন প্যান্ডেল তৈরি করা জরুরি।

জামায়াত জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের মুহতারাম খতীব মাওলানা উবায়দুল হকের নিকট সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করল। জামায়াতের তরফ থেকে বলা হলো, যেহেতু জামায়াত প্যান্ডেল তৈরি করলে তারা তা ব্যবহার করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেহেতু আপনার দায়িত্বেই প্যান্ডেল তৈরি হোক। খতীব সাহেব দায়িত্ব নিলেন। তিনি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও মাওলানা যাইনুল আবেদীনকে প্যান্ডেল তৈরির দায়িত্ব দিলেন।

উভয় দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্যান্ডেলের খরচ জামায়াতকেই বহন করতে হলো।

উপরিউক্ত দলের প্রধানগণ জামায়াতের উপর সরাসরি হামলা করে বক্তব্য রাখেন। আর যারা জামায়াতের আকীদা খারাপ বলে দাবি করেন তাঁদের মূলধন হলো কতক ভিত্তিহীন ও মিথ্যা উদ্ধৃতি। মাওলানা মওদূদীর লেখাকে বিকৃত করে এমন কতক উদ্ধৃতি প্রচার করা হলো, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদার বিপরীত। এ সবের ভিত্তিতেই মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে। এসব উদ্ধৃতি যে মিথ্যা তা কুমিল্লা জেলার বরুড়ায় প্রমাণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়ও মামলা দায়ের করা হলে তা প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ। যারা মিথ্যা উদ্ধৃতি তৈরি করছেন তাদের কি আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় আছে? যাচাই না করেই যারা ঐ সব মিথ্যা উদ্ধৃতি প্রচার করেন, আল্লাহর দরবারে তাদের বিচার একদিন অবশ্যই হবে।

## মাওলানা মওদূদী (র)-বিরোধী ফতোয়া

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) কুরআন মাজীদের তাফসীর ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনীসহ ইসলাম সম্পর্কে ছোট-বড় শতাধিক বই লিখে গেছেন। তাঁর অগণিত পাঠক-পাঠিকা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। যেহেতু তিনি অনেক কিছু লিখেছেন তাই তাঁর লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যারা জ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত তারা যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তার লেখার সমালোচনা করলে তাতে অবশ্যই দীনের উপকার ও খিদমত হবে। এ বিষয়ে উপমহাদেশের কয়েকজনের সমালোচনামূলক লেখা পড়ে আমিও অনেক উপকৃত হয়েছি।

কিন্তু কিছুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে সেগুলোর এমন বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন, কোনো নিরপেক্ষ পাঠক মূল বই ও সমালোচকদের লেখা এক সাথে মিলিয়ে পড়লে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, লেখকের মূল বক্তব্যের সাথে ঐসব সমালোচনার কোনো মিল নেই। কতক সমালোচকের ভাষা তো অত্যন্ত বিদ্বেষমূলক এবং জঘন্য।



www.icsbook.info

যারা অন্ধসমালোচক ও বিদ্বেষী তারা সংশোধনের উপযোগী ভাষা ব্যবহার না করে ফতোয়ার হাতিয়ার ব্যবহার করেন, এমনকি কারো কারো বক্তব্য হীন গালি-গালাজের পর্যায়েও পড়ে। যারা সত্য তালাশ করেন তারা যদি মূল বই পড়ার চেষ্টা করেন তাহলেই এ ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবেন। আর যদি মূল বই বাদ দিয়ে শুধু সমালোচকের লেখা পড়েই সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তারা অবশ্যই লেখকের প্রতি অবিচার করবেন। আসামির জবানবন্দি না নিয়ে শুধু ফরিয়াদির নালিশ শুনেই যে বিচারক রায় দিয়ে বসেন, তাকে কখনও ন্যায়বিচারক বলা চলে না।

মাওলানা মওদূদী লিখেছেন বলেই কোনো কথা সঠিক বলে আমি গ্রহণ করি না। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল সহকারে যেসব কথা তিনি পেশ করেছেন, তা আমার বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা যাচাই করেই গ্রহণ করি। তাই যারা দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে তাঁর সমালোচনা করেন তাদের কথাও গ্রহণ করতে আমি দ্বিধা করি না। কারণ, মাওলানা মওদূদী (র)-কে আমি নির্ভুল মনে করি না। কিন্তু যারা ফতোয়ার ভাষায় কথা বলেন, তারা মাওলানার ভুল সংশোধনের পরিবর্তে তাঁর সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কথা বলেন বিধায় আমি তাদের কথা বিবেচনাযোগ্যই মনে করি না।

মাওলানা মওদূদী (র)-এর 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' নামক বই সম্পর্কে বাংলাদেশের কয়েকজন আলেম জোর আপত্তি তুলেছেন। এর মধ্যে হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এর লেখা 'ভুল সংশোধন' নামক পুস্তকটিকে আমি অবশ্যই পড়ার যোগ্য মনে করি। মাওলানা ফরিদপুরী (র) মাওলানা মওদূদী (র)-কে অত্যন্ত মহব্বত করতেন এবং আমাকেও খুব স্নেহ করতেন। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার দরুন আমি জানতাম যে, 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি আছে। তিনি মাওলানা মওদূদী (র)-এর নিয়তের উপর হামলা করতেন না এবং তাঁকে সাহাবায়ে কেরামের বিরোধী বলেও মনে করতেন না। 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' লিখতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী (র) যেসব ঐতিহাসিকের হাওয়ালা দিয়েছেন তাদের কয়েকজনকে মাওলানা ফরিদপুরী (র) শিয়া বলে মনে করতেন এবং শিয়া ঐতিহাসিকের মতামত গ্রহণ করার ফলেই লেখক ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

মাওলানা ফরিদপুরী (র) 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইটির সমালোচনায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে বোঝা যায় যে, তাঁর অন্তরে বিদ্বেষ নেই এবং পূর্ণ ইখলাসের ভিত্তিতেই তিনি তা লিখেছেন। তাঁর বই-এর 'ভুল সংশোধন' নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বইটি লিখেননি। মাওলানা মওদূদীর লেখাকে যেখানে তিনি ভুল মনে করেছেন, সেখানেই সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য বইটির কোথাও কোথাও এমন কিছু কথা আছে, যা মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর স্বভাবসুলভ শালীন ভাষার সাথে মিল খায় না। সেসব কথা অন্যের সংযোজন



www.icsbook.info

কি না তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। বইটির প্রকাশক তার শুরুতেই কয়েকজন আলেমের অত্যন্ত অশালীন কিছু বক্তব্য যোগ করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বইটির সকল বক্তব্য মাওলানা ফরিদপুরীর নয়।

যারা সুবিবেচক ও সত্য তালাশ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অনুরোধ করছি, তারা যেন 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইখানার সাথে ফরিদপুরী (র)-এর লেখা 'ভুল সংশোধন' পুস্তকটি মিলিয়ে পড়েন। যেসব আপত্তি 'ভুল সংশোধন'-এ তোলা হয়েছে এর জবাবও মূল বইয়ের শেষভাগে দেওয়া হয়েছে। বইদুটি পড়ে যেখানে যেখানে মাওলানা মওদূদী (র) ভুল করেছেন বলে পাঠকের ধারণা হয় সেসব কথা গ্রহণ না করলেই হলো। কোনো লেখকের সব কথাই সঠিক হওয়া জরুরি নয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা) সম্পর্কে যেসব কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেটাকেই ভিত্তি করে কোনো কোনো সমালোচক মাওলানা মওদূদী (র)-কে সাহাবায়ে কেরামের নিন্দাকারী ও অপমানকারী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাদের লেখার বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা দেখে মনে হয় যে, মাওলানা মওদূদী (র) যেন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বইটি লিখেছেন। অথচ 'তাফহীমুল কুরআন' নামক মাওলানার তাফসীর ও অন্যান্য অনেক বইয়ে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা মোতাবেক যেসব উচ্ছ্বসিত ও আবেগপূর্ণ প্রশংসা করা হয়েছে, সেসব কথা তারা পড়েছেন কি না জানি না। 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা) সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তার সবটুকু আমিও সমর্থন করি না এবং গ্রহণও করিনি। কিন্তু তাই বলে মাওলানা মওদূদী (র)-কে সাহাবীবিদ্বেষী বলে প্রচার করা মওদূদী-বিদ্বেষেরই পরিচায়ক।

'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইয়ে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা ইসলামের ইতিহাসের এমন কিছু দুঃখজনক ঘটনার সাথে জড়িত যে, যারাই এ বিষয়ে কলম ধরবেন তাদের পক্ষে একই সাথে হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) সঠিক নীতির উপর কায়েম ছিলেন এমন কথা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা অনুযায়ী হযরত আলী (রা) খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত। অথচ হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকে মেনে নেননি। এ অবস্থায় উভয়ই কি করে একই মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন?

মাওলানা ফরিদপুরী (র) হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে হযরত আলী (রা)-এর চেয়েও অনেক বেশি যোগ্য খলিফা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ রয়েছে সবই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন। এ সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে কেন খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন না, সে এক বিরাট প্রশ্ন।



www.icsbook.info

হযরত মুয়াবিয়া (রা) সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। তাঁকে খলীফা না বলে আমীর মুয়াবিয়া (রা) বলা হয়। এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) ইসলামের বিরাট খিদমত করেছেন এ কথা স্বীকার করে নিয়েও ইসলামী খেলাফতের নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে ঐতিহাসিকগণ তাঁর নীতিকে সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। যারাই হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পক্ষে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারা খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং এ ইতিহাস এমন সমস্যাপূর্ণ যে, তাঁদের উভয়কে একই মর্যাদার অধিকারী মনে করা এক প্রকার অসম্ভব।

এ বিষয়ে মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর যোগ্য শাগরিদ অধ্যাপক মাওলানা মুনীরুজ্জামান ফরিদীর 'মাওলানা ফরিদপুরী সাহেব ও মাওলানা মওদূদী সাহেবের চিন্তার সমন্বয়' নামক পুস্তিকার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তাই ইতিহাসের অনিবার্য প্রয়োজনে যারা এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাদের কথা নিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় চর্চা করা মোটেই উচিত নয়। কেননা যারা ঐতিহাসিক নয়, তারা এ নিয়ে বিতর্ক করতে গেলে তাতে ফিতনা সৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশি।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী (র) কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'কে আইনের উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। ইজমা' মানে সর্বসম্মত রায়। উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওলামায়ে কেরাম কোনো বিষয়ে একমত হলে সেটাকেই যিনি শরীআতের হুজ্জাত বা দলীল বলে স্বীকার করেন তিনি যে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা'কে আরও উচ্চমানের হুজ্জাত মনে করেন তাতে সন্দেহ করার কোনো যুক্তি নেই।

১৯৫০ সালে আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী (র)-এর সভাপতিত্বে করাচিতে অনুষ্ঠিত সর্বশ্রেণীর ৩১ জন প্রখ্যাত আলেমের যে সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি ঘোষণা করা হয় সেখানে মাওলানা মওদূদী (র) যোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তদানীন্তন পাকিস্তানের ৩১ জন শ্রেষ্ঠ আলেমের মধ্যে মাওলানা মওদূদী (র) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যারা ফতোয়া দেন তারা নিজেদের মর্যাদাই নষ্ট করেন। যুক্তির মাধ্যমে মাওলানা মওদূদী (র)-এর বক্তব্য খণ্ডন করা অবশ্যই দীনী দায়িত্ব। কিন্তু ফতোয়া প্রচারের মাধ্যমে দীনের কোনো উপকার হচ্ছে কি না তা বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করছি।

আরও একটা কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে হয়। মাওলানা মওদূদী (র)-এর বিরুদ্ধে পাক-ভারত ও বাংলাদেশের কয়েকজন আলেম অবশ্যই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দুনিয়ার বড় বড় আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ



www.icsbook.info

মাওলানা মওদূদী (র)-কে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও ইসলামের মহান বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকার করে থাকেন। তাঁর লেখা তাফসীর ও অন্যান্য বই দুনিয়ার ৪০টি ভাষায় তরজমা হয়ে লাখ লাখ লোকের নিকট ইসলামের আলো পৌঁছাচ্ছে। সুতরাং এ দেশের কিছু সংখ্যক লোক ফতোয়া দিয়ে এ আলোকে চাপা দিয়ে রাখতে পারবেন না। আমার বিশ্বাস, তারা যদি মাওলানা মওদূদী (র)-এর বইগুলো মন দিয়ে পড়তেন তাহলে সেগুলোকে অবশ্যই পছন্দ করতেন।

## মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর বই সম্পর্কে মাওলানা ইউসুফ

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এর নামে প্রকাশিত 'ভুল সংশোধন' নামক বই সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ তাঁর 'মাওলানা মওদূদীর বিরোধিতার অন্তরালে' বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মাওলানা ইউসুফের ভাষায় :

"হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব ছিলেন এ দেশের একজন খ্যাতনামা অনন্য চরিত্রের অধিকারী আলেমে দীন। তিনি ওলামায়ে দেওবন্দের হালকায় শামিল থাকা সত্ত্বেও সকল ধরনের আলেম ও ইসলামপন্থির মহব্বত ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এর মূলে ছিল তাঁর উদার মনোভাব। তিনি অত্যন্ত বিশাল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন এবং ছিলেন সকল প্রকার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুবই মহব্বত করতেন। আমি জাতীয় পরিষদ সদস্য থাকাকালীন (১৯৬২-১৯৬৫) ইসলামের পক্ষে জাতীয় পরিষদে আমার ভূমিকায় তিনি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আমার জন্য দুআ করেছিলেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। ইলমী আলোচনার মাধ্যমে চিন্তার ঐক্য ও ভুল বোঝাবুঝির অবসানকল্পে তিনি একাধিক বার তাঁর উপস্থিতিতে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় আলেমদের সাথে দেওবন্দী হালকার আলেমদের আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। তাঁর ইনতিকালের কয়েক মাস আগে এ ধরনের একটা বৈঠকের ব্যবস্থা তাঁর গওহারডাঙ্গাস্থ বাড়িতে করা হয়েছিল।

হযরত মাওলানা শামসুল হক (র) তখন তাঁর গ্রামের বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর একজন ভক্ত মুরীদ ও খুলনা শহরের অধিবাসী মাওলানা হাজী আহমদ আলীর মাধ্যমে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য দু'বার করে খবর পাঠালে আমি বর্তমান ইত্তেহাদুল উম্মাহর মজলিসে সাদারাতের সদস্য জনাব মাওলানা ফজলুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে মাওলানা ফরিদপুরীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে লঞ্চযোগে খুলনা হতে গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় গিয়ে পৌঁছি।

গওহারডাঙ্গা মাদরাসার মুহতামিম হযরত মওলানা আবদুল আজিজ সাহেব চা-নাস্তার পর আমাদের নিয়ে ফরিদপুরী সাহেবের বাড়িতে আসেন। আমরা যখন হযরত মাওলানা শামসুল হক (র) সাহেবের বাড়িতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি তখন ছিল ১৯৬৮



www.icsbook.info

সালের এপ্রিল মাস, এরপর তিনি আর ঢাকায় ফিরে আসেননি। এভাবেই রোগাক্রান্ত অবস্থায় ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (আমার সাথে সাক্ষাতের দশ মাস পর) তাঁর গ্রামের বাড়িতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছার পর তিনি মাদরাসা হতে কয়েকজন আলেমকে ডেকে পাঠান এবং কিতাবাদিসহ তাঁর কাছে আসতে বলেন। অতঃপর উপস্থিত আলেমগণ হযরত মাওলানার নির্দেশে মাওলানা মওদূদী (র) প্রণীত 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' পুস্তক হতে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) সম্পর্কিত কয়েকটি উক্তি পাঠ করেন এবং তারীখে ইবনে কাছিরের হাওয়ালা (রেফারেন্স) দিয়ে মাওলানা মওদূদীর উক্তিকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। প্রকাশ থাকে যে, ঐ বৈঠকে যে দুটি বিষয় সম্পর্কে 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত'-এ লিখিত মাওলানা মওদূদীর উক্তিকে ভুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল আমি তারীখে ইবনে কাছিরের মাধ্যমেই তার জবাব দেই। কেননা, তারীখে ইবনে কাছিরেই মাওলানা মওদূদীর বক্তব্যের পক্ষে মযবুত দলীল বিদ্যমান।

আলোচনার এক পর্যায়ে আমি উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের সামনে হযরত মাওলানা শামসুল হক (র) সাহেবকে এ কথা বলেছিলাম যে, আমি কামিল ক্লাসে হাদীস অধ্যয়নকালে ইসলামের ইতিহাস সবটাই পড়ার মোটামুটি চেষ্টা করেছি। দিল্লীর 'নদওয়াতুল মুছান্নেফীন' কর্তৃক প্রকাশিত 'তারীখে মিল্লাত'-এর ছয়টি খণ্ডই আমার কাছে আছে। এর ১ম দিকের কয়েকটি খণ্ড (বনূ উমাইয়াদের ইতিহাসসহ) লিখেছেন হযরত মাওলানা কাজী যয়নুল আবেদীন দেওবন্দী। আমি এ কথা বলার সাথে সাথেই হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব মাওলানা যয়নুল আবেদীন সাহেবের ভূয়সী প্রশংসা করলেন ও বললেন, আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয় জানার জন্য দেওবন্দে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি খুব বড় আলেম ও মোহাক্কেক ছিলেন। হযরত ফরিদপুরীর কথা শেষ হতেই আমি বললাম, ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী (রা) ও আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ও ঘটনাসমূহ পড়ার পর মহান ব্যক্তিদ্বয়ের ব্যাপারে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছে এবং উভয়ের জন্য মনের মণিকোঠায় আলাদা আলাদা মর্যাদাও নিরূপিত হয়েছে। 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইখানা পাঠ করার পর আমার ঐ ধারণার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কেননা, ইসলামের ইতিহাস যারা লিখেছেন (আরব ঐতিহাসিক হোক কিংবা অনারব ঐতিহাসিক, কাজী যয়নুল আবেদীন দেওবন্দীসহ) তাঁদের থেকে ভিন্ন কোনো কথা মাওলানা মওদূদী তাঁর পুস্তকে লিখেননি। এ কথা বলেই আমি আমার ব্যাগ হতে কাজী যয়নুল আবেদীন প্রণীত 'তারীখে মিল্লাত' বইখানা বের করে তা থেকে হযরত আমীর মুয়াবিয়া প্রসঙ্গে লিখিত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর (কাজী যয়নুল আবেদীনের) কয়েকটি উক্তি পাঠ করে শোনালাম, যার ভাষা ছিল মাওলানা মওদূদীর ভাষা থেকে কড়া এবং মন্তব্য ছিল 'খেলাফত ও মুলুকিয়াতে'র মন্তব্য হতে কঠোর।



www.icsbook.info

এরূপর আমি উপস্থিত ওলামায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললাম, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর ব্যাপারে এত কড়া কথা লেখার পরও কেন মাওলানা কাজী যয়নুল আবেদীন দেওবন্দী ও তাঁর মতো অন্যান্য ইসলামী ইতিহাস লেখকের বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে না? অথচ তাঁদের চেয়ে নমনীয় ও মার্জিত কথা লিখেও মাওলানা মওদূদী (র) ফতোয়ার শিকারে পরিণত হয়েছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। আমার মতে যেহেতু মাওলানা মওদূদী ইসলামী আন্দোলন করছেন, সেজন্যই তাঁর লেখা চালনি দিয়ে ছাঁকা হচ্ছে এবং তা থেকে ক্রটি বের করার বা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হযরত মাওলানা কাজী যয়নুল আবেদীনও যদি ইসলামী আন্দোলন করতেন তাহলে তাঁর লেখাও চালনি দিয়ে ছেঁকে তা থেকে ক্রটি বের করার বা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালানো হতো।

অতঃপর আলোচনা বৈঠকে সাহাবায়ে কেরামের 'মি'ইয়ারে হক' অর্থাৎ সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে আমি ব্যাগ হতে আমার লেখা বই বের করে তা হতে সাহাবায়ে কেরামের 'মি'ইয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে চার মাযহাবের ইমামসহ কতিপয় প্রসিদ্ধ ইমাম ও মুজাদ্দিদের উক্তি দলীলসহ পেশ করি। সে বৈঠকে যে আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব (র) ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবকে চিনতাম। অন্য যারা ছিলেন নিঃসন্দেহে তাঁরা গওহারডাঙ্গা মাদরাসার মতো একটি বড় মাদরাসার উস্তাদ ছিলেন। এসব ওলামায়ে কেরাম আমার কথা সেদিন আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন কি না জানি না; তবে আমার কথার পক্ষে পেশকৃত যুক্তি-প্রমাণের কোনো প্রতিবাদ করেননি।

এরপর আমি বললাম, আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস এই যে, পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্য সকল মানুষেরই ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তিনি যত বড় আলেম বা পীরই হোন না কেন। সুতরাং মাওলানা মওদূদী সাহেবও ভুলের উর্দ্ধে নন। তাই আপনারা মাওলানা মওদূদী সাহেবের 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইখানা আরও ভালো করে পড়ুন এবং যদি আপনাদের দৃষ্টিতে কোথাও ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় তাহলে দলীলসহ সে সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী সাহেবকে লিখুন। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার বৈঠকে যোগদানের জন্য লাহোর যাচ্ছি। সেখানে বেশ কয়েকদিন থাকব। আপনাদের লেখা চিঠি বা প্রশ্ন ওখানে খোঁজ করে বের করব এবং মাওলানা মওদূদী সাহেবের নিকট হতে জবাব লিখিয়ে নিয়ে আসব। এরপর আমি লাহোরে যাই এবং সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁদের কোনো চিঠিপত্র সেখানে পাইনি। এর ফলে আমি ধারণা করে নিয়েছিলাম, আমার সাথে আলোচনার পর তাঁরা এ সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেননি।

প্রকাশ থাকে যে, আমার সাথে ঐ ইলমী আলোচনার মাত্র ১০ মাস পর হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর গ্রামের বাড়িতে



www.icsbook.info

ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের ছয় বছর পর তাঁর নামে 'ভুল সংশোধন' নামক একখানা বই ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে প্রকাশ করা হয়।

মাওলানা শামসুল হক সাহেব (র) (আল্লাহ তাঁর কবরকে নূর দ্বারা আলোকিত করে দিন) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা হেতু নিজে কিতাব পড়তে পারতেন না এবং কিছু লিখতেও পারতেন না। আমার ধারণা (সঠিক বিষয় আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন), কতিপয় জামায়াতবিদ্বেষী আলেম এই বইখানা লিখে তাঁর নামে প্রকাশের জন্য ইজাযত চেয়েছিলেন। হয়ত তখনই তিনি ঐসব আলেমদের সাথে তাঁর সামনে আমার ঐ ইলমী আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। অতঃপর আমার সাথে ঐ ইলমী আলোচনার প্রেক্ষিতে এ বই প্রকাশের ইজাযত তিনি দেননি। এ ধরনের একটা কথা আমি কারো কারো মুখেও শুনেছি।

আমার প্রশ্ন, এ বইখানা প্রকাশ করা যদি হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব খুব জরুরি মনে করতেন তাহলে তিনি তা জীবদ্দশায়ই প্রকাশ করে যেতেন। আর যদি তিনি বইখানা প্রকাশ করার অসিয়ত করে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর ভক্তরা এ ছোট্ট বইখানা প্রকাশ করতে ছয় বছর সময় বিলম্ব করল কেন?

এই বইয়ের বেশ কিছু জায়গায় এমন অশালীন ও আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যা হযরত মাওলানার তবিয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কারো সমালোচনা করলেও কোনো অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন বলে প্রমাণ নেই। বইটির ঐ জাতীয় ভাষাই প্রমাণ করে যে, এটা তাঁর লেখা নয়।

দেওবন্দসহ উপমহাদেশে যত দারসে নেজামী মাদরাসা আছে তাতে ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হয় না। কেননা, তাদের নেছাবে তারীখ (ইতিহাস) অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে কোনো কোনো মাদরাসায় শুধু রাসূলের জীবনীটুকুই পড়ানো হয়। এমতাবস্থায় তারীখে ইসলাম (খোলাফায়ে রাশেদীন, বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাস) সম্পর্কে অনবহিত ঐ সব আলেমদের কাছে যখন তাদের বুজুর্গদের অভিযোগসহ হযরত আলী, হযরত হাসান (রা) ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদ সম্পর্কীয় মাওলানা মওদূদীর লেখনী পেশ করা হয়, তখন তারা কোনোরূপ তাহকীক ছাড়াই তাদের বড়দের মত সমর্থন করে থাকেন। অথচ মাওলানা মওদূদী (র) ইসলামের বিজ্ঞ পুরনো ঐতিহাসিকগণ ছাড়া আলাদাভাবে অন্য কারো তথ্য বা মন্তব্য তার পুস্তকে পেশ করেননি।"

আমি নিজেও মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর ভাষার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাই যে অংশটি অশালীন ভাষায় লেখা, তা তাঁর রচিত নয় বলে আমি নিশ্চিত।

## কাওমী মাদরাসার উস্তাদগণের প্রতি আবেদন

আপনারা আল্লাহর রহমতে আলেম হওয়ার কারণে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে কোনো বই পড়ে তা যাচাই করার যোগ্যতা রাখেন। বইটিতে কোন্ কথাটি সহীহ ও কোন্ কথাটি গলদ তা বিচার করার তাওফীক আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে



www.icsbook.info

দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী লিখিত বই পড়লেই আপনাদের গোমরাহ্ হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। আপনাদের কয়েকজন আকাবিরের কিছু বিরূপ মন্তব্যের দরুন আপনারা মাওলানা মওদূদী রচিত কিতাবাদি পড়েন না।

আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, আলিয়া নেসাবের মাদরাসায় শিক্ষিত আলেমগণ মাওলানা মওদূদী লিখিত বই পড়ে আধুনিক উচ্চশিক্ষিত লোকদের নিকটও অত্যন্ত চমৎকারভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার যোগ্যতা হাসিল করেছেন।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা কামালুদ্দীন জাফরী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ইকামাতে দীনের আন্দোলনে যে যোগ্য ভূমিকা পালন করছেন তা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন। মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীর এবং ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে তাঁর রচিত কিতাবাদিই তাঁদেরকে এ যোগ্যতা প্রদান করেছে।

আলিয়া নেসাবে পাস-করা আলেমগণের এক বিরাট সংখ্যা জামায়াতে ইসলামীতে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন। আপনারা কি তাঁদেরকে আলেম হিসেবে গণ্য করেন না? তাঁরা কি যোগ্যতার সাথে ছাত্রদেরকে কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ পড়াচ্ছেন না?

আপনারা যদি মাওলানা মওদূদী রচিত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন তাহলে এ যোগ্যতা আপনারাও অর্জন করতে পারবেন। আধুনিক যুগে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মোকাবিলায় ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে মানব সমাজকে উন্নত করতে পারে সে বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য ছাড়া সঠিক জ্ঞান আর কোথায় পাবেন? আধুনিক শিক্ষিত লোকদের নিকট ইসলামকে যোগ্যতার সাথে পরিবেশন করতে হলে মাওলানা মওদূদীর লেখা বইপত্র পড়া জরুরি।

আমাদের মতো লাখ লাখ আধুনিক শিক্ষিত লোক ইসলামের সঠিক ও ব্যাপক জ্ঞান অর্জনের যে মহাসুযোগ লাভ করেছিলেন, মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য অধ্যয়নের সুযোগ না পেলে তাঁরা এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারতেন না।

আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট সংখ্যক ছাত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চা করছে এবং এ দেশে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে গড়ে তুলছে। ইসলামবিরোধীদের হাতে তারা শহীদও হচ্ছে। মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যই তাদের মাঝে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার এ জযবা যুগিয়েছে।

## মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মূল্যায়ন

২০০৩ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আমি এবং পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের ১৫ জন নেতা দু'দিনব্যাপী অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। মালয়েশিয়ার একজন ইংরেজিতে, ইরানের



www.icsbook.info

মাওলানা ইসহাক মাদানী উর্দুতে এবং বাকি ১২ জনই আরবীতে বক্তৃতা করেন। তারা বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মুসলিম উম্মাহর সমস্যা ও মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন। আমি এখানে শুধু মাওলানা মওদূদীর অবদান সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁরা যা বলেছেন শুধু তা-ই উল্লেখ করছি :

## শায়খ ড. ইউসুফ আল কারদাভী

মিসরের অধিবাসী, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ ড. ইউসুফ আল কারদাভী বলেন,

"১৯৫৮ সালে আল ইমাম মওদূদীর সাথে কায়রোতে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি 'আরদুল কুরআন' সফরে মিসর গিয়েছিলেন। (তাফহীমুল কুরআন লেখার প্রয়োজনে তিনি ঐসব স্থান সফর করেন, যেগুলোর নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর তাফসীরে ঐসব এলাকার নকশা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সফরসঙ্গী মাওলানা আসিম আল হাদ্দাদের উর্দুতে লেখা 'আরদুল কুরআন কা সফর' নামক বইয়ে ঐ সফরের বিবরণ আমি পড়েছি, −লেখক) শায়খুল আযহারের বাড়িতে তার সম্মানে এক সমাবেশ হয়। শায়খুল আযহারের অনুরোধে তিনি সেখানে সূরা আল ফাতিহার চমৎকার তাফসীর পেশ করেন। আমি ১৯৪০ সাল থেকেই তাঁর লেখা পড়ছিলাম।

"ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি কাতার এলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিরাট জনতা রাস্তায় নেমে এল। কাতারের চিফ জাস্টিস শায়খ আল হামূদ স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হলেন। অথচ তিনি কখনো কারো অভ্যর্থনা করতে যেতেন না।

১৯৬৯ সালে আমি তিন সপ্তাহ লাহোরে ছিলাম। তখন অতি নিকট থেকে মাওলানাকে দেখা ও বোঝার সুযোগ পাই। চতুর্থ বার ১৯৭৪ সালে আমেরিকার বাফেলোতে তাঁর ডাক্তার ছেলের বাড়িতে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি চিকিৎসার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। সর্বশেষ সাক্ষাৎ তখন হয়, যখন আমি তাঁর আখেরী সফরে শরীক হই। তাঁর জানাযায় লাখ লাখ লোক শামিল হয়। তার জানাযায় ইমামতি করার সৌভাগ্য আমারই হয়েছিল।

মাওলানা আমাদের, আমরাও মাওলানার। ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ ও ইমাম মওদূদীর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ এক। জামায়াতে ইসলামী যেমন ইখওয়ানুল মুসলিমূন, ইখওয়ানও তেমনি জামায়াতে ইসলামী। মাওলানা ছিলেন এ সৃষ্টিজগতের জন্য আল্লাহর এক অমূল্য উপহার।

তিনি বিশাল সাহিত্য রচনা করেন এবং নিজেই ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি অনেক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়। কোনো কিছুই তাঁর দৃঢ়তাকে দমন করতে পারেনি। তিনি মুজাহিদের জীবনযাপন করেন এবং মুজাহিদের মৃত্যুই বরণ করেন। তিনি এমন এক জামায়াত রেখে গেছেন, যা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছে।



www.icsbook.info

তিনি তাঁর যুগে একই সাথে 'মুফাক্কিরে আকবর' (শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ), 'মুজাদ্দিদে মুতলাক' (উন্মুক্ত মুজাদ্দিদ) ও 'আযীম মুসলিহ' (মহান সংস্কারক) ছিলেন। আল্লাহ আমাদেরকে এ দাওয়াত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন।

আমি যখন ইমাম তাইমিয়্যা ও ইমাম ইবনে কাইয়্যেমের সাথে মাওলানা মওদূদীর তুলনা করি তখন মাওলানার ইসলামী আন্দোলনকে তাদের আন্দোলনেরই অনিবার্য অংশ বলে মনে করি।

মাওলানা মওদূদীর আন্দোলনের প্রভাব আমি সর্বত্র লক্ষ্য করছি। বিশেষ করে মিসরে 'ইখওয়ানুল মুসলিমূন' নাম ব্যবহার করতে সরকার বাধা দেয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদের সংগঠনের নাম রাখা হয়েছে 'জামায়াতে ইসলামী' এবং সে জামায়াতে ইসলামীর সর্বস্তরের সভাপতিদের পদবি হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মতো 'আমীর' পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।"

## রাশেদ আল গানুশী

তিউনিসে নাহদাত আন্দোলনের প্রধান শায়খ রাশেদ আল গানুশী এক যুগ ধরে ইংল্যান্ডে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। ১৯৯৫, ১৯৯৯ ও ২০০১ সালে আমি ইংল্যান্ড সফরে গেলে প্রতিবারই তাঁর সাথে দেখা হয়। তিনি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী চিন্তাবিদ এবং মাওলানা মওদূদীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি সম্মেলনে মাওলানার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন,

"মাওলানা মওদূদী আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিতদের উপযোগী যুক্তি ও ভাষায় ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে যেভাবে পেশ করেছেন এবং তা বাস্তবে কায়েম করার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এর জীবন্ত রূপ এখানে স্বচক্ষে দেখলাম। বিশ্বে যে বিরাটসংখ্যক লোক মাওলানার ভক্ত রয়েছে, তারা যদি পাকিস্তানে আসে তাহলে এ বিশাল দেশের মাটিতে তাদের স্থান সংকুলান হবে না।

আমি সাইয়েদ মওদূদীর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তাঁর সাহিত্য আমাকে জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি দিয়েছে। সাইয়েদ মওদূদী, হাসানুল বান্না শহীদ ও ইমাম খোমেনী এ শতাব্দীর চিত্র পরিবর্তনে মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম উম্মাহর উপর চাপিয়ে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বিরুদ্ধে তারা সফল যুদ্ধ করেন। ফলে চিন্তার জগতে মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পরিত্যাজ্য বলে সচেতন সকল মুসলমানের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে।

তিউনিসে কীভাবে ইসলামকে ভিত্তিমূল থেকে উৎখাত করার অপচেষ্টা চলছে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা হাসিল করার জন্য পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সম্প্রতি তিউনিস সফর করেছেন। আমি পাকিস্তানের জনগণকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তারা যেন এমন জাহিলিয়াতের দিকে না যান, যা নবীর যুগের পূর্বে চালু ছিল। এ জাহিলিয়াত বরং ঐ জাহিলিয়াতের চেয়েও মারাত্মক। এটা তথাকথিত মডার্ন (আধুনিক) ইসলামের জাহিলিয়াত।"



www.icsbook.info

এ কথা বলার পর তিউনিস সরকার আধুনিকতার নামে ইসলামের সকল ভিত্তিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যা যা করেছে তা তিনি বিস্তারিত বললেন। শুনে সবাই স্তম্ভিত হলো। একটি মুসলিমপ্রধান দেশে এসব করা কেমন করে সম্ভব হচ্ছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। সেখানকার মোট আশি লাখ জনগণের এক-তৃতীয়াংশই জেলখানায় আবদ্ধ। এর মধ্যে হাজার হাজার আলেমও রয়েছেন।

তিউনিস ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীনে থাকাকালে সেখানে মুসলমান নামধারী হাবীবুর রকীবার মতো বিরাট সংখ্যক লোক তৈরি হয়েছে, যারা ক্ষমতাসীন হয়ে যা যা করেছে এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. কুরআনকে আরবীর বদলে ফরাসি অক্ষরে পড়তে বাধ্য করা।
২. প্রথম হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত সেই যাইতুশ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া, যেখানে ইবনে খালদূনের মতো মনীষী শিক্ষা লাভ করেছেন।
৩. তিউনিসের পুরাতন সব আইন বাতিল করে ফরাসি আইন চালু করা।
৪. মহিলাদেরকে স্বাধীন হওয়ার জন্য ইসলাম থেকে তাদেরকে স্বাধীন হতে বাধ্য করা।
৫. বেহেশত ও দোযখে বিশ্বাস করাকে কুসংস্কার বলে ঘোষণা করা।
৬. পর্দানশীন মহিলাদেরকে মঞ্চে এনে প্রকাশ্যে তাদের পর্দা ছিঁড়ে ফেলা এবং ঘোষণা করা যে, এছাড়া প্রগতি সম্ভব নয়।
৭. রমযানে প্রকাশ্যে মদ পান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এটাকে জরুরি এবং রোযা রাখাকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক বলে ঘোষণা করা।

এসব অবিশ্বাস্য রকমের বিবরণ দেওয়ার পর তিনি মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে যাবতীয় অস্পষ্টতা দূর করে দিতেও সক্ষম হন। তিনি বলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সব রকমের বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পাকিস্তানের ও অন্যান্য বহুদেশের সুখবরের দিন ঘনিয়ে আসছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের সকল ইসলামী শক্তির ঐক্য এ কথাই প্রমাণ করে।

মাওলানা মওদূদী, ইমাম খোমেনি ও সাইয়েদ কুতুব ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন। পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ নেতা কাযী হুসাইন আহমদ এবং তাঁর সাথীগণ জামায়াতে ইসলামীকে এক বিরাট শক্তিতে পরিণত করেছেন। বর্তমানে সেখানে ফেরকাবন্দি ও পারস্পরিক বিরোধিতার মেঘ কেটে যাচ্ছে। এটা গোটা মুসলিম উম্মতের জন্য একটি বিরাট সুখবর। পাকিস্তানে ঐক্যের এ প্রচেষ্টাকে অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।"

## মুস্তাফা মুহাম্মদ তাহ্যান

কুয়েতের ইখওয়ান নেতা মুস্তাফা মুহাম্মদ তাহ্যান বলেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের যৌথ শক্তি উসমানী খিলাফতকে খতম করার পর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে, যাতে আবার ইসলামী খিলাফত বিশ্বে কায়েম হতে না পারে। তারা মুসলিম



www.icsbook.info

বিশ্বে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এ বিশ্বাসই গড়ে তুলেছে যে, ইসলামকে মসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন এবং ইসলামও অন্যান্য ধর্মের মতোই একটি ধর্ম মাত্র।

ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ এবং শায়খ আবুল আ'লা মওদূদী এর মারাত্মক পরিণতি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই তারা চিন্তার ময়দানে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে পেশ করে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং কর্মের ক্ষেত্রে এক কার্যকর ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলেন। এর ফলেই সারা বিশ্বে আজ ইসলামের বিরাট জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে।"

**আয়াতুল্লাহ তাসখীরী**

ইরানের উচ্চমানের নেতা আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ আলী তাসখীরী আরবীতে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "আমি গৌরব বোধ করছি যে, আমি এমন এক মজলিসে শরীক হয়েছি, যেখানে একদিকে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অপরদিকে বিংশ শতাব্দীর এক মহান ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইকবালের ঝলক দেখতে পাচ্ছি।"

ইকবালের বাণী ছিলো, 'মুসলমান কুরআন ছাড়া বিজয়ী হতে পারবে না।' সাইয়েদ মওদূদী একথার বাস্তব রূপদান করেছেন। মাওলানা মওদূদী আধুনিক শিক্ষিতদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও অন্যান্য আধুনিক মতবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে এক বিরাট শক্তিতে পরিণত করেছেন। তাঁর সাহিত্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ও ইসলামী আইন রচনার ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করে।

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে আল্লামা মওদূদীর রূহ থেকে ফায়েয হাসিলের তাওফীক দিয়েছেন, তাদেরকে আমি আন্তরিক সালাম জানাই।

সাইয়েদ মওদূদী তার যুগের চেয়েও অগ্রগামী আলেম ও মুজাহিদ ছিলেন। তিনি গোটা বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের ভিত রচনা করেন। ইমাম খোমেনী এই দাওয়াতের উপরই বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মাওলানা মওদূদী মুসলিম উম্মাহর নেতা ছিলেন। তিনি সারা দুনিয়াকে যে বিপ্লব ও আন্দোলনের পথ দেখালেন, সে পথেই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া আমাদের উপর ফরয। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেই আমরা সফল হতে পারব।

ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্দেশ্যে তাঁর জ্ঞান ও চিন্তা থেকে এমন এক দর্শন স্পষ্ট হয়ে সামনে এসেছে, যা সর্বদিক ও সর্ববিভাগে ব্যাপ্ত। তিনি যখন এর প্রতি মানুষকে আহ্বান জানালেন তখন গোটা পাশ্চাত্য তাঁর এ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। সাইয়েদ মওদূদী বললেন, 'দীন ইসলাম শুধু ব্যক্তির নয়; বরং গোটা মানবতার উন্নতি সাধন করে।'

পাশ্চাত্য মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত করতে চায়। তারা ইরান, মিসর, ইরাক ও অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলোকে তাদের ইসলামপূর্ব গৌরবময় ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত



www.icsbook.info

করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সাইয়েদ মওদূদী ইসলামের সঠিক ধারণা পেশ করেছেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনকে বাতিল বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি মধ্যপন্থির উম্মতকে মানব জাতির উপর সত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়ানোর দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর দাওয়াতের সৌন্দর্য ও যুক্তির তুলনা নেই। তিনি পুঁজিবাদের গোমর ফাঁক করে দেন এবং মানবতার শোষক হিসেবে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনিই সবার আগে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাষায় পেশ করেন। ইরানে আয়াতুল্লাহ্ বাকের এ চিন্তাধারার ভিত্তিতেই অগ্রসর হন। আমাদেরকেও এ ভাবধারার অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

সকল ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তাবিদকে সম্মিলিতভাবে এ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে যেখানেই ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সম্ভব হয় সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে তা চালু করা যায়। আফগানিস্তানে এটাই ছিল সমস্যা। এখন ইরাকে ঐ একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। সাইয়েদ মওদূদী এ কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, বিভিন্ন দল ও মতের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক নৈকট্য গড়ে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই। শতকরা মাত্র ৫ ভাগকে এর ৯৫ ভাগের উপর মতপার্থক্যের প্রাধান্য দিয়ে গোটা উম্মতকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। ৯৫ ভাগ ঐক্যের উপর কোনো গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। পাশ্চাত্যের এ প্রচারণা অর্থহীন যে, মুসলমানদের দীন এক নয় এবং তারা একমত হয়ে কোনো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে অক্ষম। কিছুসংখ্যক ক্ষমতালিপ্সু ও নেতৃত্বলোভী আলেমকে ব্যবহার করে উম্মতকে বিভক্ত করে রাখার এ ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা অবশ্যই করতে হবে।"

## ডাক্তার তোয়াহা রামলী

মালয়েশিয়ার ইসলামী পার্টির নেতা ও পার্লামেন্ট সদস্য ডাক্তার তোয়াহা রামলীই শুধু ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "মাওলানা মওদূদীকে এ যুগের মুজাহিদ বললে ভুল হবে না। পাকিস্তানের জনগণের এটা বিরাট গৌরব যে, তারা এ যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব থেকে ফায়েয হাসিল করেছেন। তাঁর দেওয়া শিক্ষার একজন ছাত্র হিসেবে আমিও গৌরব বোধ করছি যে, আমি তাঁর চিন্তাধারা থেকে পথনির্দেশ হাসিল করেছি। তিনি যুবসমাজকে মসজিদমুখী করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন। আমি একজন ডাক্তার হিসেবে চিন ও সিঙ্গাপুরে পরিবার-পরিকল্পনার কুফল দেখে মনে করছি যে, আল্লাহ তাআলা এ কাজের জন্য মাওলানাকে সালেহ হিসেবে গণ্য করবেন।

এখন মাওলানা মওদূদী আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই। হাসানুল বান্না ও সাইয়েদ কুতুব শহীদ হয়ে গেছেন। তাঁরা ইসলামকে যতটুকু এগিয়ে দিয়ে গেলেন, সেখান থেকে তাঁদের আন্দোলনকে চূড়ান্তভাবে সফল করার দায়িত্ব আমাদের।

১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার অহংকার ও গৌরব ধ্বংস হওয়ার পর এর জন্য ইসলাম ও মুসলিমদেরকে অন্যায়ভাবে দায়ী করে তারা আমাদের বিরুদ্ধে হিংস্রভাবে প্রতিশোধ



www.icsbook.info

নিতে চাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে এবারই প্রথম বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে সমবেত হয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী এ পরিস্থিতিতে কেমন করে এত বড় আয়োজন করতে সক্ষম হলো তা ভেবে আমরা বিস্মিত হয়েছি। বুঝতে পারলাম যে, মাওলানা মওদূদীর বিশাল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে সমবেত করা সম্ভব হয়েছে।"

## মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক মাদানী

মাওলানা ইসহাক মাদানী ইরানের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তিনি হিন্দুস্তানে লেখাপড়া করায় উর্দুতেই বক্তব্য রাখলেন। তিনি মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বলেন, "মাওলানা বর্তমান যুগের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে ইসলামকে এমন চমৎকারভাবে পেশ করেছেন, যার ফলে শিক্ষিত অনেক মুসলিম ইসলামের বিজয়ের জন্য জীবন দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে উত্থাপিত সকল বিভ্রান্তি ও সন্দেহ দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। ইরানে মাওলানা মওদূদীর মিশনকেই বিপ্লবের আকারে চালু করা হয়েছে।"

সম্মেলনের সকল অতিথি বক্তাই মাওলানা মওদূদীকে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক ও বাস্তব সংগ্রামী হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। যে কয়েকজনের বক্তব্য আমি উদ্ধৃত করেছি তাদের মূল্যায়নের সাথে শব্দের পার্থক্য থাকলেও ভাবের মধ্যে সুস্পষ্ট মিল থাকায় এখানে সকলের বক্তব্য উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করছি না।

## আমার মনে বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি হলো

বহু দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মুখে মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে এত উচ্চ মানের মূল্যায়ন শুনে আমার মনে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হলো যে, আমাদের দেশের আলেমগণের মধ্যে যারা মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন তারাই কি শুধু ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী? বিশ্বের সেরা ইসলামী চিন্তাবিদগণ মাওলানা মওদূদীকে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম বা অন্ততপক্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ বলে প্রশংসা করেন। তাঁরা কি সবাই বিভ্রান্ত? আরব বিশ্বের আলেমগণ মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারাকে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা বলে স্বীকৃতি দেন কেমন করে? তাহলে কি আমাদের দেশের আলেমগণের মধ্যে যারা মাওলানা মওদূদীকে গোমরাহ বলে প্রচার করেন তারাই দুনিয়ার সেরা আলেম? তারাই শুধু সহী ইসলামকে চেনেন? দুনিয়ার আলেম সমাজ কি তাহলে সবাই গোমরাহ? বিশ্বে যাঁরা মাওলানা মওদূদীকে দীনের বড় আলেম হিসেবে ভালোবাসেন তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের দেশের ঐ আলেমদের মন্তব্য কী? এখন প্রশ্ন, সারা দুনিয়ার ইসলামপ্রিয় লোকেরা মাওলানা মওদূদীকে সঠিকভাবে চিনে নিলেন, অথচ আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক আলেম তাঁকে কেন চিনতে পারলেন না?



www.icsbook.info

আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশের বিরাটসংখ্যক আলেম জামায়াতে ইসলামীতে সক্রিয়ভাবে শরীক রয়েছেন। তাদের মধ্যে কি কেউ বড় আলেম নন? তারা কি সবাই গোমরাহ? দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ কি তাদেরকে গোমরাহ বলে মনে করে?

## আরও একটা প্রশ্ন

আমি পাকিস্তানে সকল ইসলামী শক্তির ঐক্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেছি। দেওবন্দী, বেরেলবী, আহলে হাদীস ও শিয়াসহ মোট ছয়টি দল মুত্তাহিদা মজলিসে আমল (MMA)-তে শরীক আছে। এতে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের উভয় গ্রুপই রয়েছে, যারা সবাই দেওবন্দী হিসেবে পরিচিত।

আমাদের দেশে দুটো রাজনৈতিক দলের সাথে দুটো ইসলামী দল মিলে চারদলীয় ঐক্যজোট গড়ে তুলেছে। এরপরও একটি ইসলামী দলের একাংশের নেতা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন, "আমরা জামায়াতে ইসলামীর সাথে রাজনৈতিক ঐক্যে শামিল হয়েছি; তাদের সাথে আদর্শিক বা ইসলামী ঐক্য করিনি।"

কিন্তু পাকিস্তানে যে ইসলামী ঐক্য হয়েছে তা শুধু রাজনৈতিক ঐক্য নয়; বরং ইসলামী আইন ও সমাজব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যেই গঠিত ঐক্য। সীমান্ত প্রদেশে তাদের ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখলাম, ১২ জন মন্ত্রীর মধ্যে ছয়জন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের এবং বাকি ছয়জন জামায়াতে ইসলামীর। চিফ মিনিস্টার জমিয়তের নেতা ও সিনিয়র মিনিস্টার জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক আমীর।

আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, পাকিস্তানে যারা পূর্বে 'মওদূদী ফিতনা' বলে অপপ্রচার করতেন তারাও ঐক্য কায়েমের পর নীরব হয়ে গেছেন এবং ইসলামী ঐক্যের সাথে সহযোগিতা করছেন। জনগণের নিকট ঐ জাতীয় প্রচারণা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তারা ঐক্যের জন্য পাগল। এবার তাহলে প্রশ্ন জাগে, পাকিস্তানের আলেম সমাজও কি জামায়াতের সাথে ঐক্য করে গোমরাহ হয়ে গেলেন?

## ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না কেন?

২০০৫ সালের ৪ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও বাইতুল মুকাররমের মুহতারাম খতীব মাওলানা উবাইদুল হক সাহেবের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। আমি তখন ম্যানচেস্টারে। ইন্টারনেট থেকে কম্পিউটারে দৈনিক সংগ্রাম প্রায় নিয়মিতই পড়তাম। ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল না হওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে যে জবাব দিয়েছিলেন তা থেকে পাঁচটি কারণ নোট করে নিলাম। ২৯ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরে আসার পর খতীব সাহেবের সাথে ফোনে আলাপকালে প্রসঙ্গক্রমে আমি ঐ পাঁচটি কারণ নোট থেকে পড়ে শোনালাম। তিনি বললেন, আরও একটি কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তিনি সে



www.icsbook.info

কারণটি ফোনে জানালে তাও নোট করে নিলাম। ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল না হওয়ার মোট ৬টি কারণ তিনি উক্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন বলে আমি নিশ্চিতভাবে জানলাম। নিম্নে আমি ঐ ক্রমানুসারেই কারণগুলো উল্লেখ করছি :

১. এক দল অপর দলকে বিদ্রূপ করা।
২. নিজের দোষ না দেখে অন্যের দোষ তালাশ করা।
৩. প্রতিপক্ষকে গালি দেওয়া ও মন্দ উপাধিতে তিরস্কার করা।
৪. নিজস্ব ধারণাবশত বিনা প্রমাণে অভিযোগ করা।
৫. আত্ম-গর্ব ও অহঙ্কারবশত ধারণা করা যে, শুধু আমরাই ঠিক; অন্য সবাই ভ্রান্ত ও ইসলামের দুশমন।
৬. কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই যা ইচ্ছা করে ফেলা।

মুহতারাম খতীব সাহেব জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি তাঁরই হয়েছে। তাই তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তা সঠিক হওয়ারই কথা।

## ইসলামী দল ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর নীতি

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীর সময় থেকেই সকল ইসলামী দল ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জামায়াত নিষ্ঠার সাথে এ নীতি মেনে চলছে যে–

১. জামায়াত কোনো ইসলামী দল ও নেতা সম্পর্কে কখনও কোনো রকম বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে না।
২. ইসলামের নামে কর্মরত কোনো দলের বা নেতার পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা হলেও জামায়াতের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণ করা হয় না। অবশ্য মন্তব্যে কোনো ভুল তথ্য থাকলে অত্যন্ত শালীন ভাষায় তা প্রকাশ করা হয়।
৩. যারা জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রচার করেন তাদের ব্যাপারে জামায়াত চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করে। ঐ ফতোয়ার উদ্দেশ্য ভুল ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করা নয়; বরং জনগণকে বিভ্রান্ত করে জামায়াত থেকে দূরে রাখা।
৪. জামায়াত কোনো ইসলামী দল ও নেতার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় না। কেউ বিতর্ক করতে চাইলে জামায়াত তাতে সাড়াও দেয় না। কারণ, বিতর্ক (বাহাস্) দ্বারা কোনো বিরোধেরই মীমাংসা হয় না; তাতে ঝগড়া বাড়ে মাত্র।
৫. কেউ যদি যুক্তি সহকারে জামায়াতের কোনো ভুল ধরিয়ে দেন তাহলে জামায়াত সেজন্য তার শুকরিয়া জানায়। অতঃপর হয় ভুলটা সংশোধন করে নেয়; নয়ত যুক্তি দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, ওটা ভুল নয়।


www.icsbook.info

এ নীতিমালা মেনে চলার উদ্দেশ্য হলো :

১. জামায়াতে ইসলামী কোনো ইসলামী দলকেই প্রকৃত দুশমন মনে করে না; বরং দীনের পক্ষে সহযোগী হিসেবে সকলকেই পেতে চায়।

২. যারা জামায়াতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বা ফতোয়ার ভাষায় কথা বলেন তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলে তারা আরও উৎসাহের সাথে আক্রমণ করতে থাকবেন। তারা শুধু ঝগড়াই করতে চান। অতএব জামায়াত চুপ করে থাকলে তাদের ঐ একতরফা ঝগড়া বেশি দিন চলতে পারে না।

৩. ইসলামের নামে প্রকাশ্য বিতর্ক ও ঝগড়া হলে তাতে ইসলামের দুশমন মহলই খুশি হয় এবং তাতে ইসলামের মর্যাদা হানিও ঘটে।

৪. জামায়াতে ইসলামী সকল ইসলামী শক্তির মধ্যে মযবুত ঐক্য চায়। তাই কোনো ইসলামী দলের সাথেই জামায়াত সম্পর্ক নষ্ট করতে চায় না।

৫. কোনো ইসলামী দলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা বা কারো মন্তব্যের প্রতিবাদে বিতর্কে লিপ্ত হওয়াকে জামায়াত সময় ও শ্রমের অপচয় বলে মনে করে। জামায়াত, ইসলামের পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কোনো ইসলামী দলের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকাই জামায়াত সমীচীন মনে করে।

## এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর দৃঢ়তা

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দেওয়ার জন্য জামায়াতের সাথে সম্পর্কিত কয়েকজন আলেম পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করলে মাওলানা কঠোরভাবে তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, আপনারা জনগণের নিকট দীনের দাওয়াত ইতিবাচকভাবে দিতে থাকুন। অপপ্রচারকদের প্রতিবাদ করে সময়ের অপচয় করবেন না। যারা আমাকে গালি দিচ্ছে তাদেরকে এভাবে নিবৃত করতে পারবেন না; বরং তারা আরও বেশি গালি দিতে থাকবে। এ জাতীয় লোকদেরকে বিরত রাখার জন্যই চুপ থাকুন। এদের কোনো জবাব না দেওয়াই তাদের জন্য সহীহ্ জবাব।

১৯৬৭ সালের কথা। মাওলানা মওদূদী জামায়াত অফিসের সামনের লনে বৈকালিক আসরে বসা। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আরো অনেকে ছিলেন। আলেমানা পোশাকপরা এক যুবক মাওলানার সামনে এসে বসল। মাওলানা তার দিকে তাকালে যুবকটি বলল, দীন সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে আমি নামকরা ব্যক্তিদের কাছে যাই। গতকাল আমি মাওলানা গোলাম গাউস হাযরাভীর খিদমতে হাজির হয়েছিলাম। তিনি এক লোকের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে বললেন, 'মওদূদীর বিরুদ্ধে আমি এত কিছু বললাম, সে কোনো জবাবই দিল না।' মাওলানা মুচকি হেসে কুরআনের একটি আয়াতাংশ উচ্চারণ করলেন, 'মূতূ বিগাইযিকুম' অর্থাৎ, 'তোমাদের ক্রোধেই তোমরা মরো।' মাওলানার প্রশান্ত চেহারার দিকে যুবকটি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকল। মাওলানা আর একটি কথাও এ ব্যাপারে বললেন না। আমি তখন তৃপ্তির সাথে মাওলানার দিকে চেয়ে রইলাম।



www.icsbook.info

জামায়াতে ইসলামীকে কি দোষী সাব্যস্ত করা যায়?

যে ৬টি কারণকে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল না হওয়ার জন্য দায়ী বলে মুহতারাম খতীব সাহেব চিহ্নিত করলেন, এর কোনো একটি কারণের সাথেও জামায়াতে ইসলামীকে জড়িত বলে প্রমাণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যিনি তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এসব কারণ আবিষ্কার করলেন তাঁকে যে কেউ জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, তিনি জামায়াতকে এর কোনো একটি কারণের জন্যও দায়ী মনে করেন কি না।

বর্তমানে (২০০৫ সাল) পত্র-পত্রিকায় সবচেয়ে বেশি অপপ্রচার চলছে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে। ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও ইসলামবিরোধী পত্রিকাগুলো তো আদর্শিক কারণেই এ অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। নিজেদেরকে কোনো ইসলামী দল বা সংস্থার লোক পরিচয় দিয়ে যেকোনো ভুঁইফোড় সংগঠনের পক্ষ থেকেও যদি জামায়াতবিরোধী কোনো বক্তব্য প্রদান করা হয় তাহলে এসব পত্রিকায় তা ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। যেসব দল বা নেতার বক্তব্য পত্রিকায় কোনো পাত্তা পাওয়ারই কথা নয়, তারাও জামায়াতের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য দিলে তা গুরুত্বসহকারে উক্ত পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করা হয়। মনে হয়, পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান পাওয়ার উদ্দেশ্যেই কতক লোক কৌশল হিসেবে জামায়াতের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ার মহাসুযোগ গ্রহণ করছে।

## আশার আলো

১৯৮০-এর দশকে আফগানিস্তানের ইসলামী দলগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ থাকত তাহলে সোভিয়েত রাশিয়া দেশটিকে দখল করতে সক্ষম হতো না এবং তাদেরকে দেশ থেকে পালিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে হতো না। নির্বাসিত অবস্থায় তারা ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয় এবং সম্মিলিত হয়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হয়। কিন্তু বিজয়ের পর অনৈক্যের পরিণামস্বরূপ তারা আবার নতুনভাবে পরাধীন হয়। নেতৃত্বের কোন্দলের ফলেই তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং তাদের উপর পুনরায় বিপর্যয় নেমে আসে।

২০০২ সালে পাকিস্তানে ইসলামী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে তারা বিস্ময়কর বিজয় লাভ করে। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানে গিয়ে সরেজমিনে তাদের মহান ঐক্যের সুফল দেখলাম। ঐক্যবদ্ধ না হলে সেখানে ইসলামী দলগুলো চরম রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হতো।

ঐ দুটো ঘটনার মধ্যে আমি কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের মতো ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হলে আগামী ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনেই তারা বিরাট সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন। ইসলামবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশে অনেক বেশি শক্তিশালী। প্রতিবেশী দেশটি তাদের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় এখানে ইসলামী শক্তির অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।



www.icsbook.info

আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করাই যদি ইসলামী দলসমূহের আসল লক্ষ্য হয় তাহলে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। নেতৃত্বের লোভ থেকে মুক্ত হতে পারলেই ঐক্য বাস্তব রূপলাভ করতে পারে।

গত ডিসেম্বরে (২০০৫) পাকিস্তান থেকে মাওলানা আবদুর রউফ মালিক নামের একজন দেওবন্দী আলেম আমার সাথে দেখা করতে এলেন। পাকিস্তানে ইসলামী ঐক্যের পেছনে তাঁর নীরব অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন, বাংলাদেশে অনুরূপ ঐক্য কায়েমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই তিনি নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে এসেছেন। তিনি তাঁর পূর্ব-পরিচিত ওলামায়ে দেওবন্দের কয়েকজনের সাথে সাক্ষাতের কথাও বললেন।

দীর্ঘ ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টায় আমার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে আমি তাঁকে জানালাম, বর্তমানে বাইতুল মুকাররমের মুহতারাম খতীবের নেতৃত্বে গঠিত 'জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল'ই বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যের একমাত্র পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান। আপনি তাঁর সাথে দেখা করুন। ঐক্যের উদ্দেশ্যে কার কার সাথে আপনার সাক্ষাৎ করা জরুরি, সে পরামর্শ তিনিই দেবেন।

তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন আবার ঐক্যপ্রচেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করি। আমি এ বিষয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। আমার বয়স ও স্বাস্থ্য এ তৎপরতার উপযোগী নয় বলে জানালাম। ইকামাতে দীনের আন্দোলনে শরীক জনশক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আমি আমার সময় ও শ্রম ব্যয় করছি। এর অতিরিক্ত কিছু করার সাধ্য আমার নেই বলে তাকে জানালাম।

তবে আমি মনে-প্রাণে দুআ করছি, ইসলামী ঐক্যের যে প্রচেষ্টা চলছে তা যেন সফল হয়। যারা এ ময়দানে সক্রিয় তাদের সাথে প্রয়োজনে আমি অবশ্যই সহযোগিতা করব বলে তাঁকে আশ্বাস দিলাম।

সমাপ্ত

www.icsbook.info

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ৭১১২২০৪, ০১৭৩০৩১৯১৭
আজাদ সেন্টার ৯ম তলা, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ০১৫২৩৮৮৪২৩, ০১৭১৫২৯২৬৬